সাপ্তাহিক

৫০ বছর ধরে অটুট ব্রাডম্যানের রেকর্ড

আনন্দমেলা

১৪ মার্চ ২০০১ দশ টাকা

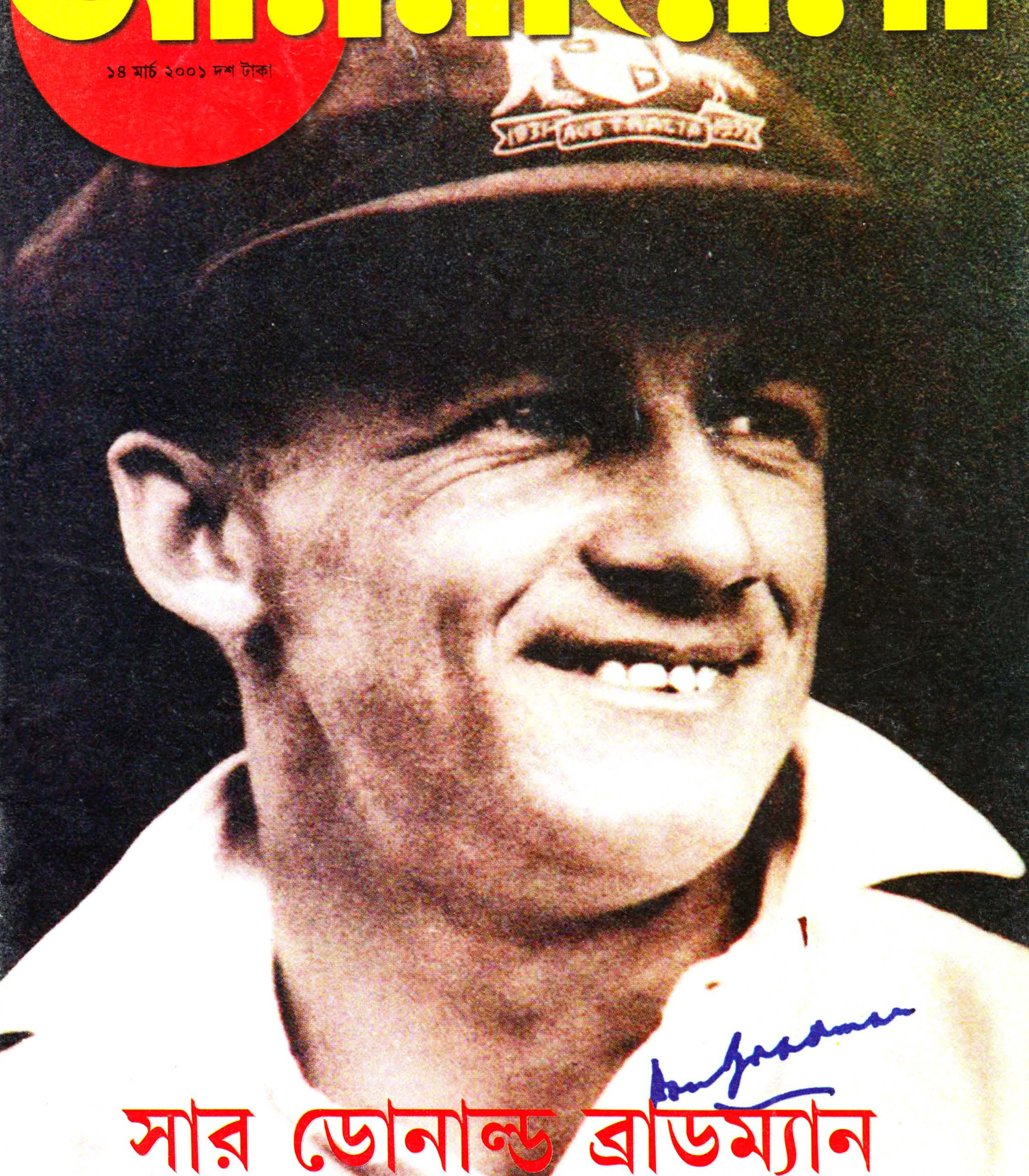

সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

(২৭ অগস্ট ১৯০৮—২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১)

Hard Copy & Scan - Wolverine
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela team for reading purpose only

Anyone can contribute to our project by sharing rare magazines.

Please reach us by email
optifmcybertron@gmail.com

এখন 100 গ্রা. বেশী সেরেল্যাক।
কিন্তু দাম বেশী নয়*।

এখন সেরেল্যাক হুইট আর সেরেল্যাক হুইট-অ্যাপেলের প্রতিটি 400 গ্রাম রিফিল প্যাকের সঙ্গে আপনি পাবেন 100 গ্রাম বেশী সেরেল্যাক – সুষম পুষ্টি, যাতে আপনার সোনামণি থাকতে পারে ছটফটে আর স্বাস্থ্যকর।

* অফার স্টক থাকা পর্যন্ত। প্যাক এই অফার ছাড়াও উপলব্ধ।

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

IMPORTANT NOTICE : MOTHER'S MILK IS BEST FOR YOUR BABY. INFANT FOOD SHALL BE INTRODUCED ONLY AFTER 4 MONTHS OF AGE.
महत्वपूर्ण सूचना: माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। ४ महीने के बाद ही उसे शिशु आहार देना शुरू करें।

Mudra : NES : 2296 Ben

২৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৩০ ফাল্গুন ১৪০৭ ১৪ মার্চ ২০০১

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

শ্রদ্ধার্ঘ্য

সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান

৪ জীবদ্দশাতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি। ব্যাট হাতে এমন অত্যাশ্চর্য একাধিপত্যের দ্বিতীয় নজির ক্রিকেট-ইতিহাসে সৃষ্টি হয়নি। ব্রাডম্যানের কয়েকটি রেকর্ড আজও বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। ব্রাডম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী লিখেছেন অভীক ভট্টাচার্য।

ছবিতে সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

৬ তাঁর জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার এবং স্মরণীয় মুহূর্তের সংগ্রহযোগ্য ফোটো-অ্যালবাম।

৫০ বছর ধরে অটুট ব্রাডম্যানের রেকর্ড

১৬ মাত্র ৫২ টি টেস্ট খেলে ৫২ বছর আগে ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও যে কোনও তুলনায়, তর্কে, আলোচনায় তাঁর নাম এসে পড়েছে অনিবার্যভাবে। তাঁর অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে। লিখেছেন প্রতাপ জানা।

ক্রিকেটই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, অর্থের প্রলোভনে পা বাড়াননি

২০ ক্রিকেটকে তিনি উন্নীত করেছিলেন শিল্পের উচ্চতায়। দর্শকদের কাছ থেকে যেমন পেয়েছেন শ্রদ্ধা তেমনই পেয়েছেন মর্যাদা। লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত।

বডিলাইন বল করেও আটকানো যায়নি ব্রাডম্যানকে

২৮ ক্রিকেটের কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯৩২-'৩৩-এর বডিলাইন সিরিজ। সেই সিরিজে লারউড একবারও গায়ে বল লাগাতে পারেননি ব্রাডম্যানের। লিখেছেন চন্দন রুদ্র।

ব্রাডম্যানের জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

৩০ ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বপ্নের সাম্রাজ্যে ব্রাডম্যানের আসন সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে জানিয়েছেন সুজন ঠাকুরতা।

অন্যান্য

বিভাগ

পাণ্ডব গোয়েন্দা • ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৩১

খাবার ও সম্পদের খোঁজে... • অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪

সাগরদ্বীপ এখনও চলে সৌরশক্তিতে • তপন বারিক ৩৬

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন... • প্রদীপচন্দ্র বসু ৩৮

বাঙালির তিন প্রজন্ম জুড়ে বেঁচে আছে গল্পের দাদা • দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ৪০

ধাঁধালি • অমল ভৌমিক ৪৪

খেয়ালখুশি ৪৫

রহস্যময় বটগাছের বয়স জানা নেই কারও • নির্মল বসু ৪৬

কী আশ্চর্য • চঞ্চল পাল ৪৭

কুইজ ৫২

সত্যজিৎ রায়ের নিদর্শন নিয়ে এক অভিনব সংগ্রহশালা • অজয় দাস ৫৫

আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের দোকান... • সুদর্শনা সেন ৫৬

টেলিভিশন ৫৮

সবুজ পাতা • জয়ন্ত বসু ৫৯

ভূতেরাই ভয় পেত আমাকে • ভোলানাথ চক্রবর্তী ৬০

এখনও চোখে ভাসে... • পলাশ নন্দী ৬১

ষোল বছর ধরে ইডেনের পিচ... • গৌতম বাগচী ৬২

জনপ্রিয়তায় বার্গক্যাম্পের সঙ্গে... • সুজন ঠাকুরতা ৬৩

সাবধান সৌরভ, ওদের একটা গিলেসপি আছে • পরমজিৎ জানা ৬৪

গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চলল সন্দীপন • সন্দীপ দাশগুপ্ত ৬৫

খেলার খবর • দর্শক ৬৬

নিয়মিত কমিক্‌স ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৪

প্রচ্ছদের ফোটো : এ এফ পি

সম্পাদক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা। বিমান মাশুল কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা।

সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান

ব্রাডম্যানের অনুরাগী কিশোররাই অনেকে এখন হয়েছেন বড় ক্রিকেটার

সদ্যপ্রয়াত ক্রিকেট-কিংবদন্তি সার ডনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী।

নাম : সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান। মানুষের কাছে পরিচিত 'ডন' নামে।

জন্ম : ১৯০৮ সালের ২৭ অগস্ট। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর কুটামুন্দ্রায়।

মৃত্যু : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

যেসব দলের হয়ে খেলেছেন : অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স।

ব্যাটিং স্টাইল : ডান হাতি।

বোলিং স্টাইল : লেগ ব্রেক।

টেস্ট অভিষেক : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে, ১৯২৮-'২৯ সালে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ সিরিজের সেটিই ছিল প্রথম ম্যাচ।

শেষ টেস্ট : ওভালে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৪৮ সালে।

সম্মান : ১৯৩১ সালে নির্বাচিত হন 'উইজডেন ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার'। ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য 'সার' উপাধি পান ১৯৪৯ সালে। ১৯৭৯ সালে তাঁকে দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া।' ২০০০ সালে শতাব্দীর সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের মধ্যে একজন বলে তাঁকে সম্মানিত করে 'উইজডেন' পত্রিকা।

ক্রিকেটজীবনের গোড়ার দিনগুলি : মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ সিডনির ক্লাব ক্রিকেটে। সেন্ট জর্জ-এর হয়ে আবির্ভাব-ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেন, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর হয়ে প্রথম আবির্ভাবেও সেঞ্চুরি করেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, অ্যাডিলেডে। ২১ বছর ধরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সার ডনের মোট রান ২৮,০৬৭। গড় ৯৫.১৭। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করেছেন ১১৭টি। সর্বোচ্চ রান ৪৫২। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর হয়ে অপরাজিত ৪৫২ রানের এই অবিশ্বাস্য ইনিংসটিই এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ইনিংস।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ার : ১৯২৮-'২৯ সালে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক-টেস্টে আহামরি কিছু করতে পারেননি। দু'ইনিংসে রান করেন ১৮ এবং এক। টেস্ট কেরিয়ার এতটাই অবিশ্বাস্য ভাল ছিল তাঁর যে, জীবনের শেষ টেস্টের শেষ ইনিংসে মাত্র চার রান করতে পারলেই তাঁর টেস্ট রানের গড় থাকত ১০০-য়। শেষবারের মতো যখন ব্যাট হাতে বাইশ গজের দিকে হাঁটা শুরু করেছিলেন, সকলেই নিশ্চিত ছিল যে, গড় ১০০-য় নিয়েই যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু শেষ ম্যাচে খেলতে নামার আবেগ হয়তো মনঃসংযোগ নষ্ট করে দিয়েছিল তাঁর। ফিরে আসেন রান না করেই।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ৫২টি টেস্টের ৮০ ইনিংসে তাঁর মোট রান ছিল ৬,৯৯৬ রান। গড় ৯৯.৯৪। সেঞ্চুরির সংখ্যা ২৯টি।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় রান করতে পারার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল তাঁর। ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিড্‌স টেস্টে একদিনে ৩০৯ রান করেছিলেন তিনি। সেই ইনিংসে তিনি করেন ৩৩৪ রান। অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে এখনও সেটিই সর্বোচ্চ স্কোর।

১৯৩২-’৩৩ সিরিজে ডগলাস জার্ডিনের বডিলাইন স্ট্র্যাটেজিও দমাতে পারেনি সার ডনকে। সেই সিরিজে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল ৫৬.৫৭, মেলবোর্নে টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল তাঁরই কৃতিত্বে।

অধিনায়ক হিসেবে ২৪টি টেস্টের মধ্যে ১৫টিতেই জিতিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে।

অবসর নেওয়ার পর ‘সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন’-এর সভাপতি হন। ক্রিকেটের জাতীয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।

মানুষ ডন : মাঠের বাইরেও এক অননুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সার ডন। জীবনে কোনওদিন ধূমপান করেননি, ছোঁননি অ্যালকোহল। বাঁধনছাড়া হইচই একেবারেই পছন্দ করতেন না। অবসর নেওয়ার পর নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মিডিয়ার নাগাল থেকে। সারা জীবনে পারেননি কেবল একটিই কাজ। চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি নিজের কিংবদন্তি হয়ে ওঠা।

অভীক ভট্টাচার্য

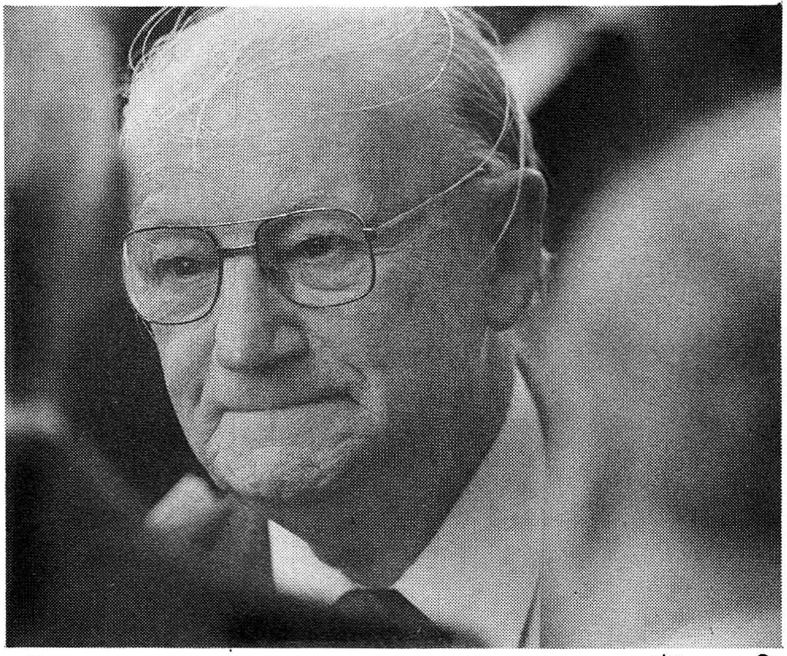

পরিণত বয়সে

ফোটো : এ এফ পি

ডন প্রতি ঘণ্টায় রান করেছেন ৪০, মোট রান ৫০,৭৩১

টেস্টে ইনিংস প্রতি রানের গড় ৯৯.৯৪, প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ধরলে সামান্য কম—৯৫.১৪। এক শতকে শুধু নয়, এক সহস্রাব্দে এরকম অবিশ্বাস্য রানের গড় দ্বিতীয় আর কোনও ব্যাট্‌সম্যানের পক্ষে করা অসম্ভব। আরও অনেক কীর্তি আছে তাঁর। প্রতি ঘণ্টায় গড়ে সার ডন রান করেছেন ৪০। ২.৭ ইনিংস পরপরই করেছেন একটি শতরান। টেস্ট ম্যাচের একদিনেই তাঁর সংগ্রহ ৩০০ রান, টেস্টে দুটি ত্রিশত রান, ১০টি দ্বিশতরান। পরিসংখ্যানের খাতা যে প্রত্যেকবারই তিনি নতুন করে লিখতে বাধ্য করেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জীবনে ডন সব মিলিয়ে খেলেছেন ৬৬৯টি ম্যাচ, নট আউট থেকেছেন ১০৭ বার, সর্বোচ্চ রান করেছেন অপরাজিত ৪৫২, মোট রান করেছেন ৫০,৭৩১, গড় ৯০.২৭। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা শেফিল্ড শিল্ডে ৯৬টি ইনিংসে তাঁর রান ৮৯২৬, গড় ১১০.১৯। বিশ্বের কোনও প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় কোনও ক্রিকেটারের এই গড় রান নেই। ডন ব্রাডম্যানের টেস্ট শতরানের মোট সংখ্যাও ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়েছে—২১১টি। এই পরিসংখ্যান দেখে ভারতের ‘লিট্‌ল মাস্টার’ সুনীল গাওস্কর মন্তব্য করেছিলেন, “মনে হয় কোনও মানুষ নয়, অতিমানব বা যন্ত্র এই রান করেছে। যন্ত্রও অবশ্য এই রান করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেত।”

একদিনের ক্রিকেটেও সেরা হতেন তিনি : স্টিভ ওয়

গতবারের বিশ্বকাপ জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-দলনায়ক স্টিভ ওয় ব্রাডম্যান দর্শনে গিয়েছিলেন অ্যাডিলেডে তাঁর বাড়িতে। স্টিভ জানিয়েছেন, সেটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা। সার ডোনাল্ডকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল স্টিভের। কিন্তু মাত্র দেড় ঘণ্টা যেন চোখের নিমেষে কেটে গিয়েছিল। স্টিভ অবশ্য এই ভেবেই খুশি যে, সোফা সেটে তাঁর উলটোদিকে এতটা সময় বসে ছিলেন স্বয়ং ডন। স্টিভ অবশ্য কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন ডনকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, “কীভাবে অন্যদের চেয়ে এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন আপনি?” ডনের উত্তর, “আমি সেরা ছিলাম না। আমার চেয়ে সে সময় অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার ছিল।” স্টিভের পরবর্তী প্রশ্ন, “আপনি কীভাবে এত ভাল খেলেছেন?” উত্তর, “আমি ক্রিকেটের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। মনঃসংযোগও করেছি কম নয়।” স্টিভ জানিয়েছেন, যেহেতু তিনি একজন অধিনায়ক, তাই ডনকে এই প্রশ্নটি করার লোভ সামলাতে পারেননি, “আপনি কেমন অধিনায়ক ছিলেন সার?” ডনের সরাসরি উত্তর, “সাধারণ।” স্টিভ এই উত্তরে আশ্চর্য হননি, বরং সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের স্বাভাবিক সৌজনাবোধ, বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্টিভকে সার ডোনাল্ড জানিয়েছিলেন, তিনি একদিনের ক্রিকেটের দারুণ ভক্ত।

ছবিতে সার ডোনাল্ড

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ডন ব্রাডম্যান যেদিন মারা যান সেদিন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-দলের খেলোয়াড়রা ছিলেন মুম্বইয়ে। তাঁদের এবারের সফরে ভারতের সঙ্গে প্রথম টেস্ট শুরু হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১। তার আগে, মাঝরাতে এসে পৌঁছয় সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের মৃত্যুর খবর। টেস্ট শুরুর আগে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ব্রাডম্যানের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেন।
ফোটো : এ এফ পি

ব্রাডম্যান

সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

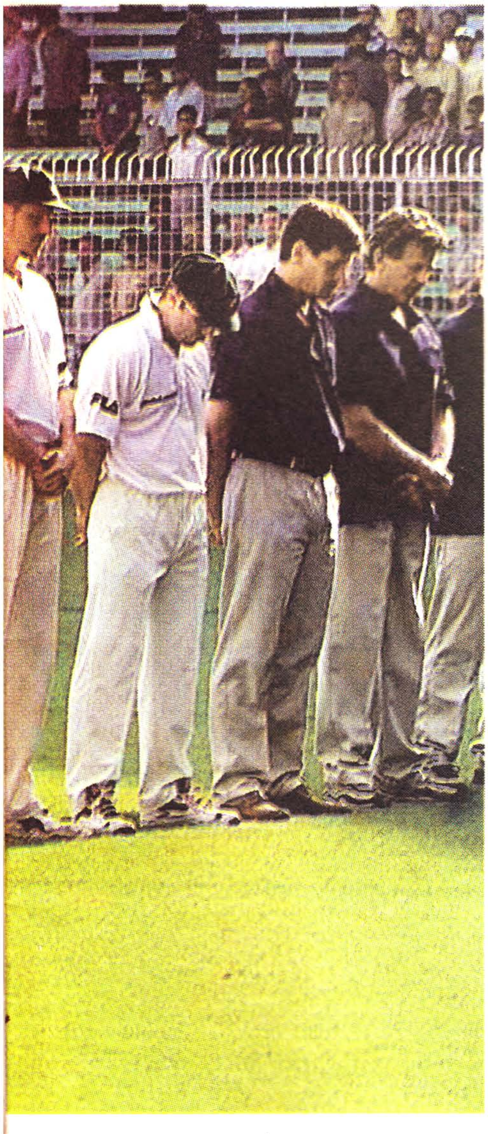

অ্যাডিলেড ওভালের স্কোরবোর্ডেও শোকের ছায়া। বিদায় সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। শুধু ক্রিকেট-বিশ্বই নয়, সারা পৃথিবীই ব্রাডম্যানের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। ক্রিকেট-মাঠের সীমানার মধ্যে তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ফোটো : এ এফ পি

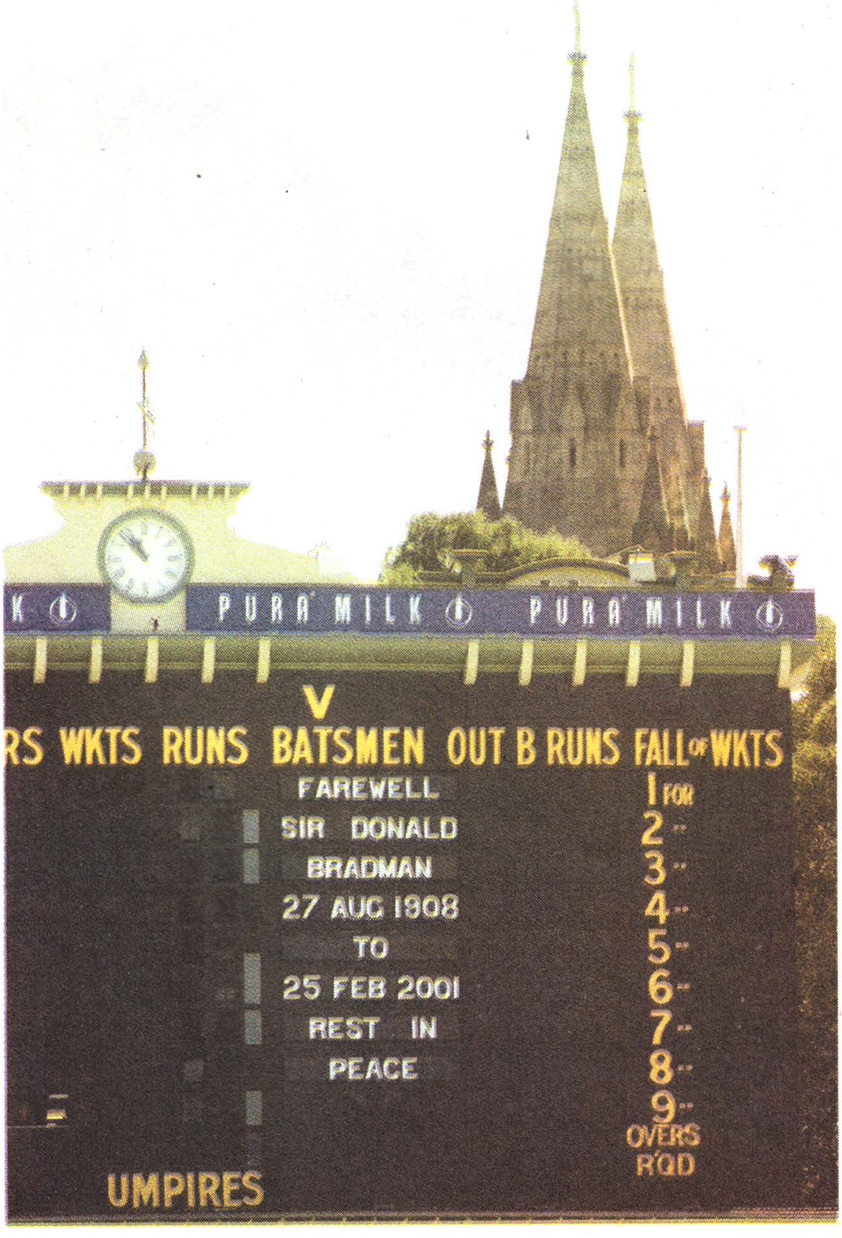

পুরনো অ্যালবাম থেকে পাওয়া ডন ব্রাডম্যানের একেবারে শৈশবের ছবি। ব্রাডম্যানকে অনেক নামে ডাকা হত—'বয় ওয়ান্ডার' বা বিস্ময় বালক, বাওরালের ছেলে, ডন ইত্যাদি। তাঁর প্রথম ডাকনাম ছিল 'ব্র্যাডি'। তাঁর পিতামহই প্রথম ব্রাডম্যান পদবিটি নিয়েছিলেন। তার আগে লোকেরা তাঁদের 'ব্রাডনাম' বলতেন।

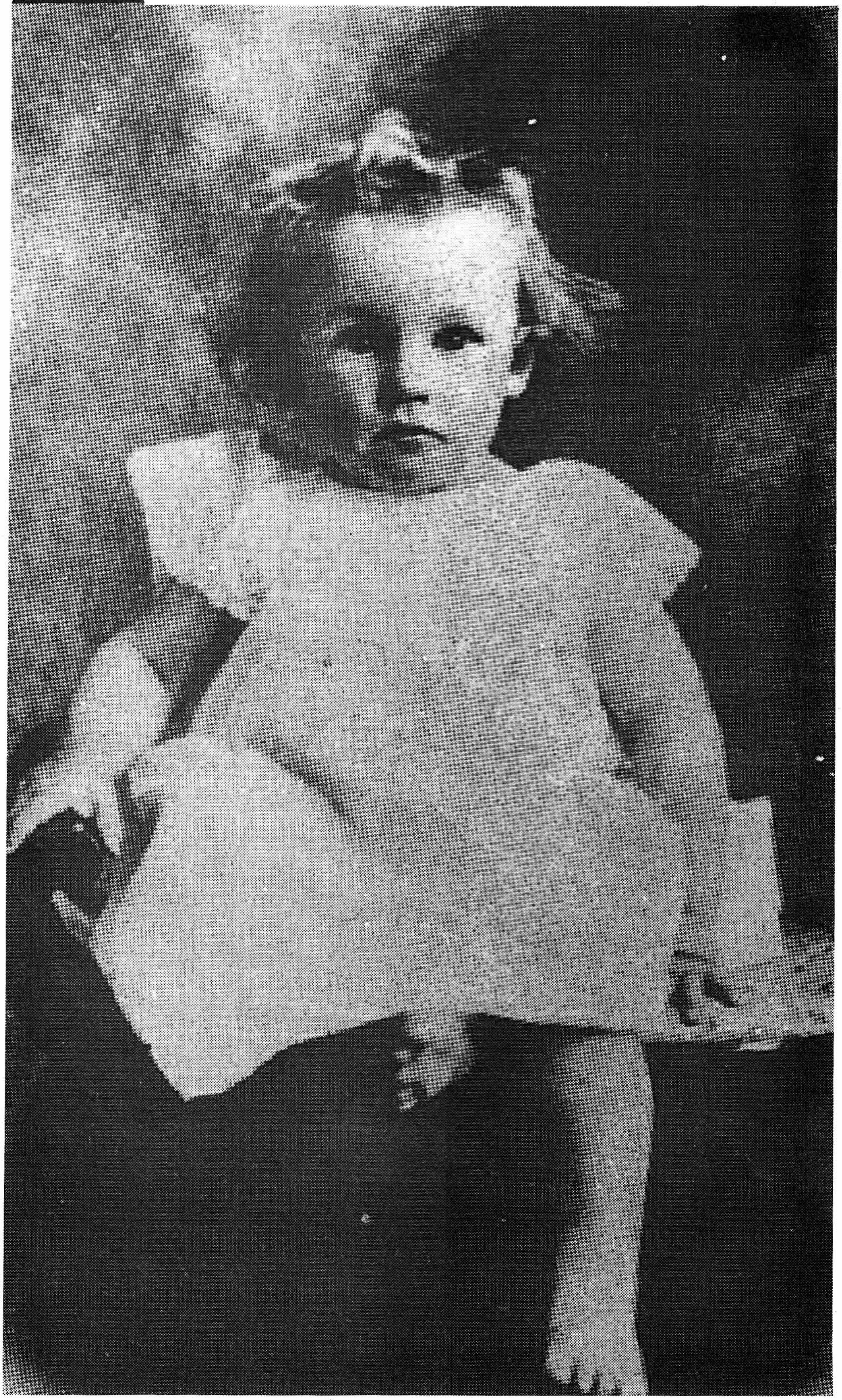

যুবক ব্রাডম্যান নিজের খেলা ছাড়া অন্য কোনওদিকে তেমন মন দেননি। আজকের মতো তখন 'স্পনশরশিপ' ও বিজ্ঞাপনের মাতামাতি ছিল না। ব্রাডম্যান ছিলেন অপেশাদার ক্রিকেটার। তাঁর রানের গড় যত অবিশ্বাস্যই হোক, তিনি বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, "আমার চেয়েও অনেক ভাল ব্যাটসম্যান আমি দেখেছি। সংখ্যায় অনেক। তবে তাঁরা আউট হয়ে যেতেন।"

অ্যাডিলেড স্টেট লাইব্রেরিতে নিজের পুরনো ব্যাট হাতে ব্রাডম্যান। তাঁকে বলা হয় বিশ শতকের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ'। অমরত্বকে কীভাবে রক্ষা করে চলতে হয়, সহজ প্রলোভন থেকে দূরে নিভৃতে কীভাবে প্রতিটি মুহূর্তে তিলে তিলে আভিজাত্যকে গড়ে তুলতে হয়, তার প্রমাণ তাঁর জীবন।

ব্রাডম্যানকে অল্প রানে আউট করার জন্য নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। নেওয়া হয়েছিল নানা কৌশল। কোনওটাই কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর শরীর লক্ষ্য বোলিংয়ের একটা কৌশল নেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউডকে দিয়ে ওরকম বল করানো হত। লারউড এত জোরে বল করতেন যে তাঁর পা দিয়ে রক্ত বেরোত। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লারউডের রক্তাক্ত পায়ের চিকিৎসা চলছে।

Monark™ BISCUITS
Shine with health

মনার্ক কুইজ

Monark Shine with health

পাপাই আর পুপদিদির এখন ব্যস্ততার শেষ নেই। দু'জনেরই সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা, কিন্তু ব্যস্ততা সেজন্য নয়। গত ১১ তারিখ থেকে কলকাতায় শুরু হয়েছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। এই পাঁচদিন বইপত্রের পাট একেবারে তুলে দিয়েছে ওরা। বাবা-মাকে কথা দিয়েছে, পরে রাত জেগে পড়াশোনা করে পরীক্ষার প্রিপারেশন ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। আপাতত ওরা ব্যস্ত কেবল ক্রিকেট নিয়েই।

পাশের বাড়ির ছোটকার সঙ্গে প্রতিদিনই মাঠে যাচ্ছে ওরা। ইডেনে খেলা দেখার মজাই আলাদা। যদিও বেশ গরম পড়ে গিয়েছে, তবু তাতে ওদের আগ্রহ একটুও কমেনি। সবুজ ঘাসের গালচে পাতা আউটফিল্ডে টুকটুকে লাল বলের ছুটে যাওয়া, সাদা পোশাকের ক্রিকেটারদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়া -- এ কি কম আনন্দের?

অস্ট্রেলিয়া চিরকালই গ্ল্যামারাস দল। গ্লেন ম্যাকগ্রার মতো বিশ্বসেরা ফাস্ট বোলার, শেন ওয়ার্নের মতো বিশ্বসেরা লেগ স্পিনার, স্টিভ ও'র মতো বিশ্বসেরা অধিনায়ক আর কোন দলে আছে?

আমাদেরও অবশ্য প্রতিভা কিছু কম নেই। সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো অসামান্য ব্যাট্সম্যানরা আছেন। প্রথম টেস্টে সচিন চমৎকার খেললেও নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সৌরভ ও দ্রাবিড়। দ্বিতীয় টেস্টেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই চাইবেন না তাঁরা। তুলনায় অবশ্যই কিছুটা দুর্বল আমাদের বোলিং আর ফিল্ডিং। কুম্বলে না থাকায় এই সিরিজে ভারতীয় বোলিংয়ের ভেদশক্তি আরও কমে গিয়েছে।

কলকাতা টেস্টে যেহেতু সিরিজের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই ভারতীয় দল এবার অনেক বেশি মরীয়া। মরীয়া সৌরভও, প্রথম টেস্টের পর ইয়ান চ্যাপেল তাঁর সম্পর্কে

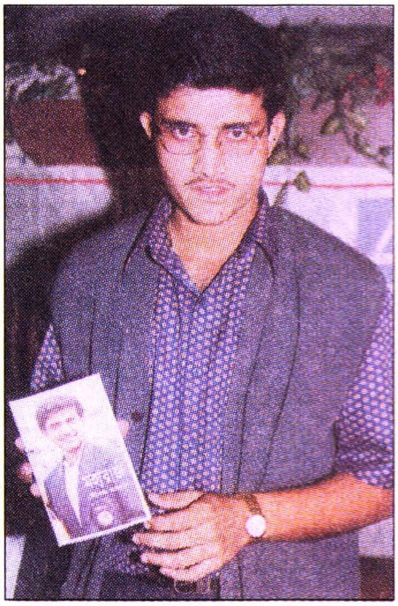

যে বিশ্রী মন্তব্য করেছেন তার উত্তর দেওয়ার চমৎকার সুযোগ ইডেনেই পাচ্ছেন তিনি। আর সৌরভ যদি সত্যিই তা পারেন, তবে পাপাই আর পুপুদিদির চেয়ে খুশি আর কেউই হবে না।

আমাদের এবারের কুইজের বিষয়ও ক্রিকেট।

প্রশ্ন

১। '৬৯-'৭০ সালে ভারত সফরে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ওই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কে ছিলেন?

২। সদ্যসমাপ্ত মুম্বই টেস্টে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন কে? ওঁর ডাকনাম কী?

৩। প্রয়াত হলেন সর্বকালের সেরা ব্যাট্সম্যান সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান। তাঁর জন্ম কত সালে?

৪। ব্রাডম্যানকে দু'বার আউট করার কৃতিত্ব আছে এক ভারতীয় বোলারের। কে তিনি?

৫। '৬৯-'৭০ এর কলকাতা টেস্টে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এক বাঙালি ক্রিকেটারকে। কে তিনি?

উত্তর

(১)বিল লরি। (২) অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। ডাকনাম গিলি। (৩) ১৯০৮ সালের অগস্টে। (৪) বিজয় হাজারে। (৫) সুব্রত গুহ।

এ সংখ্যার প্রশ্ন

'৬৯-'৭০ সালের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতা :

সাগরনীল বসু, মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা।
প্রিয়ব্রত সাধুখাঁ, টাকি, উ: ২৪ পরগণা।
অনিতা ভট্টাচার্য্য, কাঁথি, মেদিনীপুর।
অর্পণ দত্ত, পাইকপাড়া, কলকাতা।
জয়দীপ পুরকায়স্থ, আমতা, হাওড়া।

উত্তর পাঠাবার ঠিকানা ঃ
'আনন্দমেলা' এবিপি লিমিটেড
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১

পুরস্কার গ্রহণের ঠিকানা ঃ
Monarch India Pvt. Ltd.
23, Brabourne Road
7th Floor, Calcutta 700 001

Monark™ BISCUITS
Shine with health
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের জন্য
মনার্ক বিস্কুট

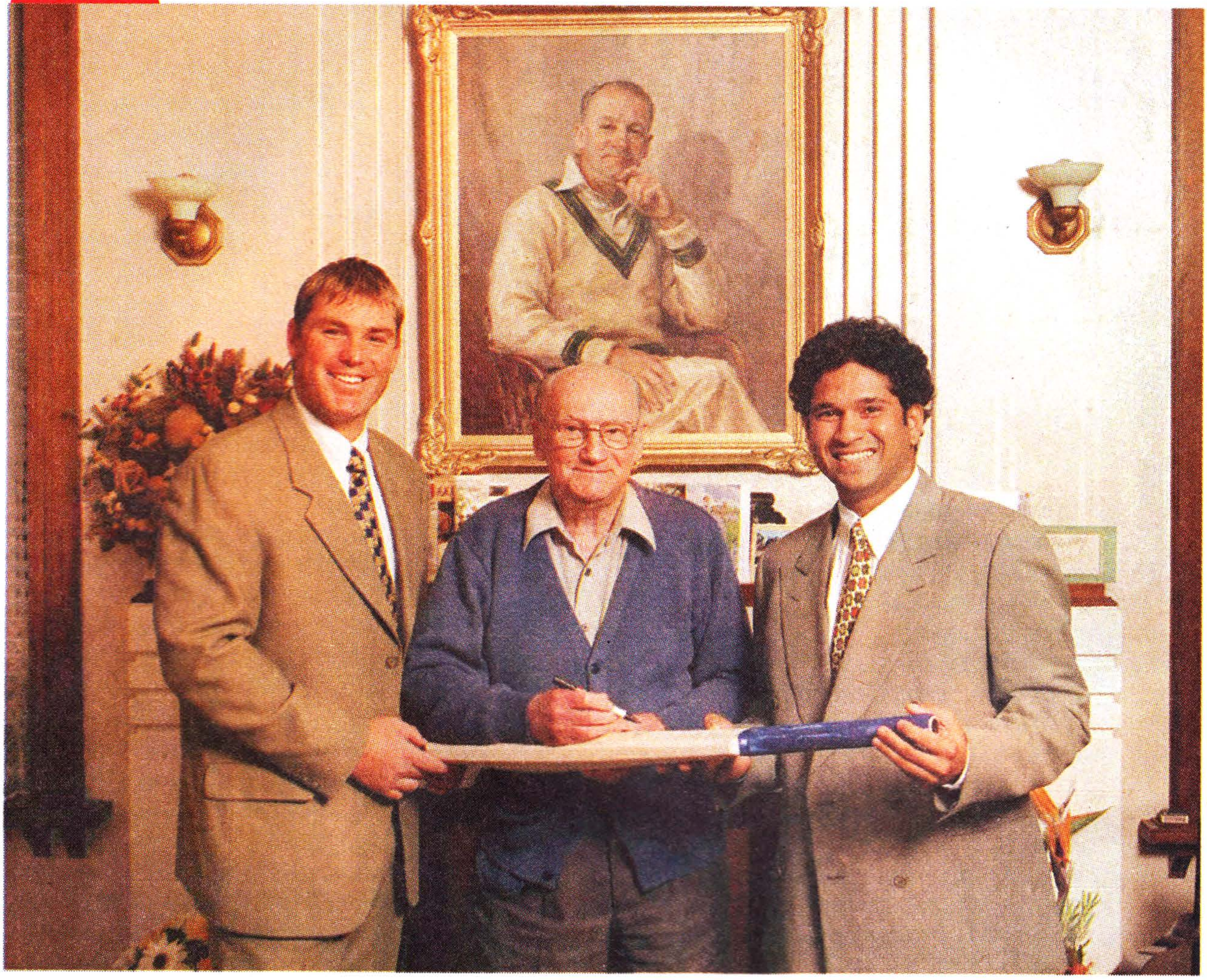

সর্বকালের সেরা সার ডনের পাশে আজকের দুই সেরা—শেন ওয়ার্ন (বাঁদিকে) ও সচিন তেন্ডুলকর।১৯৯৮-এ তাঁর জন্মদিনে, অ্যাডিলেডের বাড়িতে তোলা হয় এই ছবি
ফোটো : এ এফ পি

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-ইতিহাস নিয়ে এক মিউজিয়ামে ব্রাডম্যানের আবক্ষ মূর্তি

এই বাড়িতেই জন্মেছিলেন ব্রাডম্যান। বাড়িটিকে স্মৃতিসৌধ করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। বাওরালে ব্রাডম্যান মিউজিয়াম দেখতে প্রতি বছর ভিড় করেন অন্তত ৫০ হাজার মানুষ। বাঁদিকের ছবিতে ব্রাডম্যানকে দেখা যাচ্ছে এক বিরল মুহূর্তে। খ্যাতি-অখ্যাতি থেকে চিরদিনই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন ব্রাডম্যান। তাঁকে নিয়ে বেরিয়েছে অনেক বই। ওরকমই একটি বইয়ে তিনি চোখ বুলোচ্ছেন।
ফোটো : গৌতম ভট্টাচার্য

প্রচার মাধ্যমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে ভালবাসতেন ব্রাডম্যান। কলকোলাহল থেকে দূরে ২ নং হল্ডেন স্ট্রিট, কেনসিংটন পার্ক, পূর্ব অ্যাডিলেড দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া-৫০৬৮ ঠিকানার বাড়িটিই ছিল তাঁর আশ্রয়।

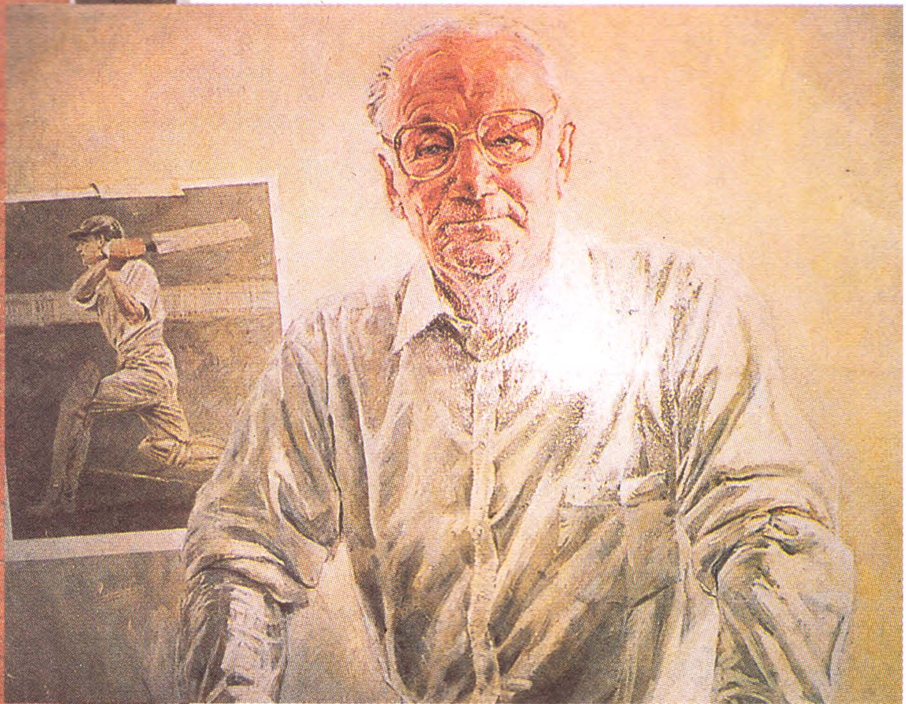

বাওরালে ব্রাডম্যান মিউজিয়ামে শুধু স্মারক-সম্ভারই নেই, আছে দুর্লভ সব ফোটোগ্রাফ ও পেন্টিং। ব্রাডম্যানের পরিণত বয়সের এই ছবিটিও আছে ওই সংগ্রহশালায়। ছবির মধ্যে আর একটি ছবি—ব্রাডম্যান ব্যাট করছেন। বয়স থেমে থাকেনি। কিন্তু ছবির মানুষটি অতিক্রম করে গেছেন কালের সীমা।

অ্যাডিলেড ওভালে সার ডনের পাশে সুনীল গাওস্কর। ডনের সঙ্গে ছবি তোলাও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে ক্রিকেট মাঠে। কারণ, ডন প্রচারের আলোর বাইরে থাকতেই ভালবাসতেন।

৫০ বছর ধরে অটুট ব্রাডম্যানের রেকর্ড

ফোটো : এ এফ পি

সদ্য প্রয়াত বিশ্বসেরা ক্রিকেটার সার ডন ব্রাডম্যানের কয়েকটি রেকর্ড আজও বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। সেই সব রেকর্ড এখনও অটুট। লিখেছেন প্রতাপ জানা

“ওর ব্যাট যেন ওর শরীরেরই অংশ, যা জীবন্ত ও সদা তৎপর। আর তাতে যেন বসানো আছে দুটি চোখ।”
ক্রিকেট- লিখিয়েদের ‘গুরু’ নেভিল কার্ডাস যাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন, সেই প্রবাদপ্রতিম সার ডন ব্রাডম্যান আর জীবিত নেই। অ্যাডিলেডে নিজের বাসভবনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর (জন্ম ২৭ অগস্ট, ১৯০৮)। অর্থাৎ বয়সের সেঞ্চুরি হল না তাঁর। ৯২-এ আউট তিনি।

সার ডন ব্রাডম্যান, এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের তাবৎ ক্রিকেট-রসিকদের মাথা শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে নুয়ে আসে। গত বছর শতাব্দীর সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের প্রশ্নে ‘উইজডেন’-এর পক্ষ থেকে ভোট নেওয়া হয়েছিল ১০০ জন বিচারকের। ব্রাডম্যানের পক্ষে ভোট পড়েছিল ‘সেন্ট পার্সেন্ট’। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডের কথায়, “ব্রাডম্যান কেবল সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারই ছিলেন না, গত ১০০ বছরে তিনিই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সেরা ক্রীড়াবিদ।” ফুটবলে পেলে কিংবা মারাদোনা, হকিতে ধ্যানচাঁদ, টেনিসে রড লেভার, ব্যাডমিন্টনে রুডি হরতনো এবং টেব্‌ল টেনিসে ভিক্টর বার্না যেমন প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব, তেমনই ক্রিকেট-দুনিয়ার কিংবদন্তি হয়ে আছেন ডন ব্রাডম্যান। ব্রাডম্যানের আগে ও পরে বেশ কয়েকজন দক্ষ ব্যাটস্‌ম্যান এসেছেন ঠিকই, কেউই কিন্তু তাঁকে সার্বিকভাবে ছাপিয়ে যেতে পারেননি। এখানেই ব্রাডম্যানের স্বকীয়তা ও অসাধারণত্ব। লেন হাটন, গ্যারি সোবার্স, সুনীল গাওস্কর, ভিভ রিচার্ড্‌স অথবা সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউই কিন্তু পরিসংখ্যানের বিচারে ব্রাডম্যানকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি।

এ-কথা সত্যি যে, পরিসংখ্যান সবসময় চূড়ান্ত কথা বলে না। তবে এর গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। যিনি ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে খেলা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেতে পরিসংখ্যানে তো নির্ভর করতে হবেই। ২০ বছরের টেস্টজীবন ডন ব্রাডম্যানের, ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য টেস্ট খেলা বন্ধ ছিল আট বছর। তাই তাঁর টেস্টজীবন ছিল প্রকৃতপক্ষে ১২ বছরের। আর তখন এত বেশি টেস্ট খেলাও হত না। ‘রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্য’—এটিই খেলাধুলোর জগতের আপ্তবাক্য। তবুও এই সময় হাজার কীর্তি ও রেকর্ড ভাঙাগড়ার মধ্যে ডন ব্রাডম্যানের কয়েকটি রেকর্ড অক্ষত আছে প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। অন্যান্য অনেক কিছু বাদ দিলেও এতেই প্রমাণিত হয়ে যায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, কেমনভাবে তাঁর সময়ে বোলারদের শাসন করতেন তিনি।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের কোটামুন্ড্রায় জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর বয়স যখন তিন বছর, পরিবারের সঙ্গে বাউরালে তাঁকে চলে আসতে হয়। এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বসবাস করতেন। ব্রাডম্যানের টেস্ট আবির্ভাব হয়েছিল ১৯২৮ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর ৯৫ দিন। এটি ছিল সিরিজের প্রথম টেস্টও। জীবনের প্রথম টেস্টে তিনি অবশ্য সুবিধে করতে পারেননি। করেছিলেন ১৮ ও ১। সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে তিনি দল থেকে বাদ যান। ফিরে আসেন মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টে। করেন ৭৯ ও ১১২। সিরিজের চারটি টেস্টে খেলে সংগ্রহ করেন ৪৬৮ রান। গড় ৬৬.৮৫। তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এগিয়েছেন ক্রমেই। এর পর ক্রিকেট-মাঠে দেখা গেছে এক ‘রান-মেশিন’-কে, যাঁর অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার বিচ্ছুরণে আলোকিত হয়েছে সকলেই। শুধু একবারই টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং গড় নেমে গিয়েছিল ষাটের নীচে (৫৬.৫৭), ১৯৩২-৩৩ সালের মরসুমে সেই বিতর্কিত ‘বডি লাইন’ সিরিজে।

Daily At Dawn

The Natal Mercury

Saturday July 12,1930

BRADMAN VERSUS ENGLAND

PUBLISHED BY THE CENTRAL NEWS AGENCY, LIMITED.

ব্রাডম্যানকে কী চোখে দেখা হত, সংবাদপত্রের এই শিরোনামই প্রমাণ

৫২টি টেস্টের ৮০টি ইনিংস খেলে (১০ বার নট আউট) তিনি রান করেছেন ৬৯৯৬। গড় ৯৯.৯৪। জীবনের শেষ টেস্টে, ১৯৪৮ সালের ওভাল টেস্টে চার রান করতে পারলে তাঁর ব্যাটিং গড় হত ঠিক ১০০। শোনা যায়, বিদায়লগ্নে চোখে জল এসে

ডন ব্রাডম্যানের সিরিজ-ভিত্তিক রান

সাল	বিপক্ষ	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ	রান	গড়
১৯২৮-২৯	ইংল্যান্ড	৪	৮	১	১২৩	৪৬৮	৬৬.৮৫
১৯৩০	ইংল্যান্ড	৫	৭	—	৩৩৪	৯৭৪	১৩৯.১৪
১৯৩০-৩১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	৬	—	২২৩	৪৪৭	৭৪.৫০
১৯৩১-৩২	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫	৫	১	২৯৯*	৮০৬	২০১.৫০
১৯৩২-৩৩	ইংল্যান্ড	৪	৮	১	১০৩*	৩৯৬	৫৬.৫৭
১৯৩৪	ইংল্যান্ড	৫	৮	—	৩০৪	৭৫৮	৯৪.৭৫
১৯৩৬-৩৭	ইংল্যান্ড	৫	৯	—	২৭০	৮১০	৯০.০০
১৯৩৮	ইংল্যান্ড	৪	৬	২	১৪৪*	৪৩৪	১০৮.৫০
১৯৪৬-৪৭	ইংল্যান্ড	৫	৮	১	২৩৪	৬৮০	৯৭.১৪
১৯৪৭-৪৮	ভারত	৫	৬	২	২০১	৭১৫	১৭৮.৭৫
১৯৪৮	ইংল্যান্ড	৫	৯	২	১৭৩*	৫০৮	৭২.৫৭
	মোট	৫২	৮০	১০	৩৩৪	৬৯৯৬	৯৯.৯৪

(* নট আউট)

ডন ব্রাডম্যানের দেশওয়ারি রান

বিপক্ষ	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ	রান	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঞ্চুরি
ইংল্যান্ড	৩৭	৬৩	৭	৩৩৪	৫০২৮	৮৯.৭৮	১৯	১২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	৬	—	২২৩	৪৪৭	৭৪.৫০	২	—
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫	৫	১	২৯৯*	৮০৬	২০১.৫০	৪	—
ভারত	৫	৬	২	২০১	৭১৫	১৭৮.৭৫	৪	১
মোট	৫২	৮০	১০	৩৩৪	৬৯৯৬	৯৯.৯৪	২৯	১৩

যাওয়ায় এরিক হোলিসের নিরীহ বলে তিনি বোল্ড হয়েছিলেন শূন্য রানে। ব্যাপারটি কিন্তু ব্রাডম্যান অস্বীকার করেছেন নিজে। বলেছেন, "হ্যাঁ, ঠিকই—ওই ইনিংসটা ছিল খুবই আবেগভরা মুহূর্ত। কিন্তু লোকে যে বলে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, তা সত্যি নয়। এতে বোলারকে ছোট করা হয়। ব্যাপারটা একেবারেই ঠিক নয়।"

৯৯.৯৪—এমন অবিশ্বাস্য রানের গড় টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে—১২৪ বছরের ইতিহাসে আর কারও আছে কি? নেই। রঞ্জি থেকে শুরু করে লারা-তেন্ডুলকরের সময় পর্যন্ত কারও এমন অভাবনীয় রানের গড় নেই। শুধু আছে সার ডনের। ষাটের সামান্য ওপরে গড় আছে মাত্র তিনজনের—দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম পোলক (৬০.৯৭), ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'ব্ল্যাক ব্রাডম্যান' জর্জ হ্যাড্‌লি (৬০.৮৩) এবং ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফের (৬০.৭৩)। ১৯৩০ সালের অ্যাশেজ সিরিজটি স্মরণীয় হয়ে আছে ডন ব্রাডম্যানের নামে। সেবার ইংল্যান্ড সফরে পাঁচটি টেস্টের সিরিজে তিনি রান তুলেছিলেন মোট ৯৭৪ রান (গড় ১০৯.১৪)। একটি টেস্ট সিরিজে এত বেশি রান আর কেউ কখনও তুলতে পারেননি। অক্ষত রেকর্ড এটিও। এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, এই সিরিজে লিড্‌সের তৃতীয় টেস্টে তিনি একদিনে অকল্পনীয়ভাবে ঝড়ের গতিতে করেছিলেন ৩০৯। তাও আবার অপরাজিত থেকে। লাঞ্চের আগে করেন ১০৫। লাঞ্চ ও চা-পানের বিরতির মধ্যে ১১৫ অর্থাৎ ২২০ নট আউট এবং দিনের শেষে অপরাজিত ৩০৯। টেস্টের আসরে একদিনে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ড এখনও এটি। এমন ইনিংসকে তো অনায়াসে 'স্বপ্নের ইনিংস' বলা যায়। এই অনন্যসাধারণ ইনিংসটি খেলার পথে ব্রাডম্যান ২০০ রান পূর্ণ করেছিলেন ২১৪ মিনিটে। এত কম সময়ে আর কেউই এখন পর্যন্ত ডবল সেঞ্চুরি করতে পারেননি। এটিও তাঁর অম্লান রেকর্ড। টেস্টের আসরে দু'বার ট্রিপল সেঞ্চুরি করার কৃতিত্বও শুধু তাঁরই। তিনি ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছিলেন দু'বারই লিড্‌সে, যথাক্রমে ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালে, ৩৩৪ ও ৩০৪ রান করে। আর টেস্টে ১০টি ডবল সেঞ্চুরি—এমন কীর্তিও আর কারও নেই। সিরিজে দুটি করে ডবল সেঞ্চুরি—তিনবার, এই রেকর্ডটিও আছে তাঁর দখলে। ১৯৩৬-৩৭ সালের সিরিজে তাঁর ৮১০ রান, অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক রান সংগ্রহের অক্ষত রেকর্ডও।

২২ বলে সেঞ্চুরি। এমন বিস্ফোরক-বিধ্বংসী ব্যাটিং-তাণ্ডবের কথা কল্পনা করা যায় কি? যায়, ব্রাডম্যান ব্যাট হাতে মাঠে থাকলে। ১৯৩১ সালের ৩ নভেম্বর ব্ল্যাকহিথে ব্রাডম্যান ব্ল্যাকহিথ আমন্ত্রণী একাদশের হয়ে লিথগো পোটারির বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিলেন এই বৈদ্যুতিক কাণ্ড। প্রথম ওভারে করেছিলেন ৩৩, দ্বিতীয় ওভারে ৪০ ও তৃতীয় ওভারে ২৭। এই দিন ব্রাডম্যান করেছিলেন ১৫০ মিনিটে ২৫৬ রান, ২৯টি চার ১৪টি ছয়ের সাহায্যে। ক্রিকেট যতদিন থাকবে, ততদিন অম্লান হয়ে থাকবে সার ডন ব্রাডম্যানের নাম।

অন্য তারকাদের পাশে ডন ব্রাডম্যান

ক্রিকেটার	টেস্ট	ইনিংস	রান	সর্বোচ্চ রান	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঞ্চুরি
ডন ব্রাডম্যান	৫২	৮০	৬,৯৯৬	৩৩৪	৯৯.৯৪	২৯	১৩
গ্রেম পোলক	২৩	৪১	২,২৫৬	২৭৪	৬০.৯৭	৭	১১
জর্জ হ্যাডলি	২২	৪০	২,১৯০	২৭০★	৬০.৮৩	১০	৫
হারবার্ট সাটক্লিফ	৫৪	৮৪	৪,৫৫৫	১৯৪	৬০.৭৩	১৬	২৩
এডওয়ার্ড প্যান্টার	২০	৩১	১,৫৪০	২৪৩	৫৯.২৩	৪	৭
কেন ব্যারিংটন	৮২	১৩১	৬,৮০৬	২৫৬	৫৮.৬৭	২০	৩৫
এভার্টন উইকস	৪৮	৮১	৪,৪৫৫	২০৭	৫৮.৬১	১৫	১৯
ওয়াল্টার হ্যামন্ড	৮৫	১৪০	৭,২৪৯	৩৩৬★	৫৮.৪৫	২২	২৪
গারফিল্ড সোবার্স	৯৩	১৬০	৮,০৩২	৩৬৫★	৫৭.৭৮	২৬	৩০
সচিন তেন্ডুলকর	৭৯	১২৫	৬,৪১৬	২১৭	৫৭.২৮	২৪	২৪

★ *নট আউট*

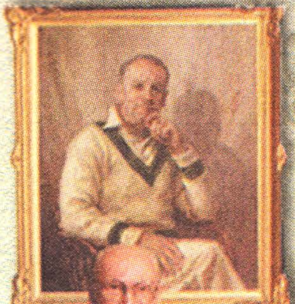

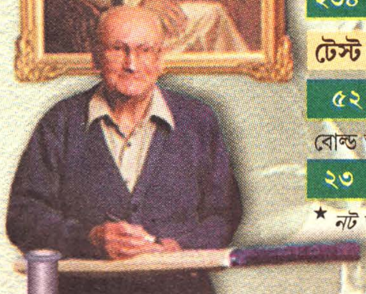

রান-মেশিন

মোট ম্যাচ

ইনিংস	অপরাজিত	রান	সর্বোচ্চ	গড়
৬৬৯	১০৭	৫০,৭৩১	৪৫২*	৯০.২৭

প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ

ম্যাচ	ইনিংস	নট আউট	রান	৫০	সেঞ্চুরি	গড়
২৩৪	৩৩৮	৪৩	২৮,০৬৭	৬৯	১১৭	৯৫.১৪

টেস্ট ম্যাচ

৫২	৮০	১০	৬,৯৯৬	১৩	২৯	৯৯.৯৪

বোল্ড আউট	ক্যাচ আউট	এল বি ডব্লিউ	রান আউট	হিট উইকেট
২৩	৩৯	৬	১	১

★ *নট আউট*

সকলের চেয়ে এগিয়ে

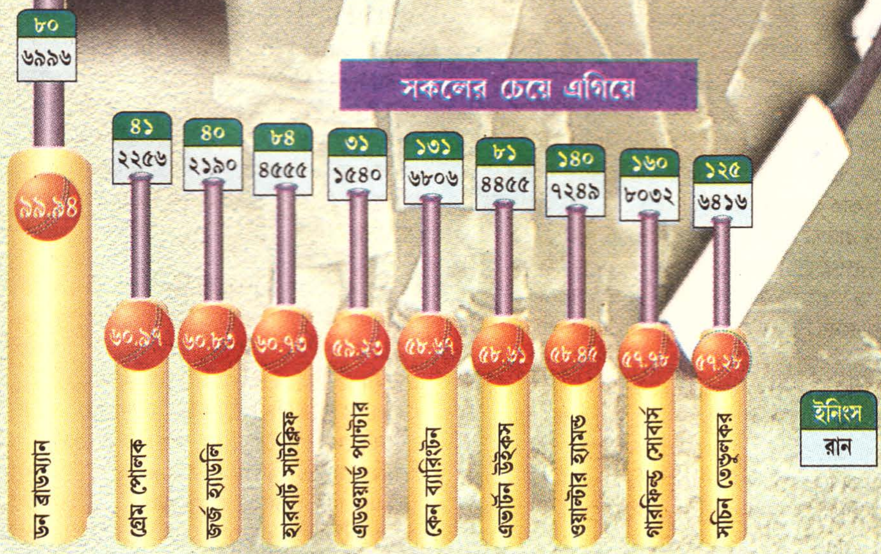

গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি

ক্রিকেটই ছিল অর্থের প্রলোভনে

একজন বড় ব্যাট্‌সম্যানকে কেবল রানের গড় দিয়েই মাপা যায় না। মানুষ ব্রাডম্যান তাঁর রানের গড়কেও অতিক্রম করে গিয়েছেন। লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, পা বাড়াননি

ধারাবাহিকতা, প্রচুর রান ইত্যাদির কথা প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু আমরা ক'জন জানি জীবনের দ্বিতীয় টেস্টেই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন ডোনাল্ড ব্রাডম্যান? ১৯২৮-এর শেষদিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি প্রথম টেস্টম্যাচ খেলেন ব্রিসবেনে। রান দু'ইনিংসে ১৮ এবং এক। মোটেই ভাল পারফরম্যান্স নয়। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট সিডনিতে, তিনি প্রথম একাদশ থেকে বাদ। জীবনে ওই একবারই তিনি ছিলেন টেস্ট ম্যাচে একাদশের বাইরে। পরিশ্রম, প্রতিভা, দক্ষতা, শিল্পীর আত্মাভিমান সব ঝাঁপিয়ে পড়ল তৃতীয় টেস্টে—ক্রিকেটই যে তাঁর সব। দ্বাদশ খেলোয়াড় হওয়ার জন্য তো তিনি ক্রিকেট খেলতে আসেননি। মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের আক্রমণ ছিন্নভিন্ন করে তিনি করলেন প্রথম ইনিংসে ৭২, দ্বিতীয় ইনিংসে জীবনের প্রথম শতরান ১১২। সেই শুরু। পরের ২০ বছর ক্রিকেট-বিশ্বের অবিসংবাদিত নায়ক রয়ে গেলেন তিনি। ২০ বছরে মাত্র ৫২টি টেস্ট খেলেছেন সার ডন। শতরান ২৯টি। মাত্র কয়েক রানের জন্য গড় ১০০ হয়নি—হল ৯৯.৯৪! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দীর্ঘ আট মরসুম (১৯৩৮-'৪৬) বাদ না সাধলে ম্যাচ, রান, শতরান, গড় কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তা ভাবলে ক্রিকেট-দেবতাও বোধহয় শঙ্কিত বোধ করতেন। বিশ্ব যা দেখল, তাও প্রায় অবিশ্বাস্য—রানের বন্যা, ব্যাটের সৌন্দর্য, যথার্থ মহানায়কত্ব। সার ডনই একমাত্র ক্রিকেটার যাঁকে নিয়ে শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, সারা বিশ্বই গর্ব অনুভব করেছে। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর কীর্তি রয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যানের জন্ম ১৯০৮-এর ২৭ অগস্ট নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের কুটামুন্ড্রায়। বাবা জর্জ, মা এমিলি। ডনের আগে চার বছরের বড় ভাই ভিক্টর। তারও ওপরে তিন দিদি আইলেট, লিলি আর মে। ডনের যখন তিন বছর বয়স, তখন কুটামুন্ড্রার উত্তপ্ত আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে তাঁদের পরিবার চলে আসে পার্শ্ববর্তী বাউরালে। সেখানেই ক্রিকেটে ডোনাল্ডের হাতেখড়ি। অতি সাধারণ পরিবার। তেমন বন্ধুবান্ধবও ছিল না তাঁর। স্কুলের

বেডসারকে শুশ্রূষার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন ডন

তিনি কত বড় মাপের ক্রিকেটার ছিলেন তা নিয়ে ভক্ত দর্শক, প্রাক্তন খেলোয়াড়, বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মুগ্ধতা সর্বদাই প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকেই ব্যাট্‌সম্যান, অধিনায়ক সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তাঁর ব্যাটিং টেকনিক, দক্ষতা নিয়ে এখনও চুলচেরা বিশ্লেষণ চালিয়ে যাচ্ছেন নানা দেশের গবেষকরা। লন্ডনের বায়োকেমিস্ট চার্ল্‌স ডেভিস দাবি করেছেন, ব্রাডম্যানের মতো অবিশ্বাস্য ব্যাট্‌সম্যান বেরোতে আরও এক লক্ষ বছর লাগবে। আরও ১০ লক্ষ টেস্ট ক্রিকেটার খেলে যাওয়ার পরে আরও একজন ব্রাডম্যানকে পাওয়ার সম্ভাবনা। রোনাল্ড পেরির লেখা ব্রাডম্যানের আত্মজীবনীতে লেখচিত্র সহযোগে এই দাবি পেশ করা হয়েছে। ব্যাট্‌সম্যান, ক্রিকেটার হিসেবে তিনি কত বড়, সে বিশ্লেষণ চলুক কিন্তু মানুষ হিসেবেও তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর মানবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। অস্ট্রেলিয়ার চিরশত্রু ইংল্যান্ডের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার অ্যালেক বেডসার একবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসে প্রবল ফ্লু-তে আক্রান্ত হন, হোটেলে সেরকম শুশ্রূষা হবে না জেনে ডন তাঁর বাড়িতে বেডসারকে নিয়ে যান এবং তাঁর সেবাযত্ন করেন। ১৯৩৪-এ ইংল্যান্ড সফরের সময় টেন্টব্রিজের মাঠের বাইরে একদিন একটি লোককে একাকী বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন ডন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিনি বোঝেন, লোকটি বেকার, বিরাট পরিবারের বোঝা তাঁর ওপর। ডন লোকটিকে মাঠের মধ্যে নিয়ে আসেন। সহ-খেলোয়াড়দের কাছ থেকে তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি অর্থ তিনিই দেন।

শেষ যাত্রায় সার ডন ব্রাডম্যান ফোটো : এ এফ পি

ছেলেরা ক্রিকেট খেলত। পাত্তা পেতেন না তিনি। তাই একা-একাই যাতে ক্রিকেট খেলা যায় সেরকম পন্থা আবিষ্কার করলেন। বাড়ির পেছনের দিকে ইটের তৈরি বিরাট একটা জলের ট্যাঙ্ক ছিল। ট্যাঙ্কের নীচের দিকটা ছিল সিমেন্ট বাঁধানো। সেখানে একটা গল্‌ফ বল ছুড়ে দিতেন, চকিতে সেই বল ফিরে আসত। একটা স্টাম্প ছিল ছোট্ট ডোনাল্ডের সংগ্রহে। সেটাকেই ব্যাট করে তাই দিয়েই পেটাতেন বলটাকে। ব্যাপারটা সহজ নয়। গল্‌ফ বল আকারে ছোট, কিন্তু লাফায় বেশি। অত্যন্ত সতর্কভাবে সেই বল মেরে আবার ফেরত পাঠাতে হত দেওয়ালে। ভয় ছিল ব্যাটে-বলে না হলে বল চলে যাবে দূরে, আর সেটা তাঁকেই কুড়িয়ে আনতে হবে। চোখ, মাথা, শরীর—সব কিছুকে একাগ্র, একমুখী রাখার এই যে ছেলেবেলার সাধনা, তা তাঁকে সারাজীবনের সাফল্যের রসদ জুগিয়েছে।

জীবনের প্রথম ম্যাচ থেকেই ডোনাল্ডকে লড়তে হয়েছে। ১১ বছরের সেই ম্যাচেও তিনিই নায়ক। ফুটবল মাঠের 'পিচ'-এ খেলা চলছিল ক্রিকেটের। ঘাসের বদলে মাটি আর ধুলোই বেশি। বিপক্ষের এক বাঁ-হাতি বোলার পর পর দু'বলে ফিরিয়ে দেয় দুই ব্যাট্সম্যানকে। 'হ্যাটট্রিক' রুখতে নামতে হয় ডোনাল্ডকে। প্রবল স্নায়ুচাপেও নিজের ব্যাটকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে ভুল করেননি তিনি। হ্যাটট্রিক রোখেন, অপরাজিত ৫৫ রানও করেন। পরে আত্মজীবনীতে ডন লিখেছেন, "প্রথম বলটা কীভাবে সামলেছিলাম, তা এখনও আমার কাছে রহস্য।"

১২ বছর বয়সে জীবনের প্রথম শতরানটির কথাও ভোলেননি ডন। বাউরাল স্কুলের সঙ্গে লড়াই প্রতিবেশী মিটাগাং স্কুলের। স্কুল দলে সুযোগ পেলেন ডোনাল্ড। সহ-খেলোয়াড়রা তাঁকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও দলের ১৫৬ রানের মধ্যে তিনি একাই করলেন ১১৫। এবং অপরাজিত। পরের দিন জয়ের জন্য হেডসারের কাছ থেকে অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে পেলেন মৃদু ভর্ৎসনাও। জয়ের আনন্দে মাঠে ব্যাটই ফেলে এসেছিলেন ডন। ১৭ বছর বয়সে ডন করলেন প্রথম ত্রিশতাধিক রান। বাউরাল দলের সঙ্গে মস ভেলের ম্যাচে তিনিই জয়ের নায়ক। এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করতে পারলে মা একটি নতুন ব্যাট কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ডন করলেন পাক্কা ৩০০। তিনটি ব্যাট তাঁর পাওনা। ডন 'খেদোক্তি' করে লিখেছেন, "ন্যায্য কারণেই আমি মা'র কাছে তিনটি ব্যাটের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু সে দাবি মা খারিজ করে দেন। একটা ব্যাট নিয়েই আমাকে খুশি থাকতে হয়।"

ডোনাল্ডের ব্যাটিং দক্ষতার কথা চারদিকে ছড়াতে লাগল। পরের বছরেই নিউ সাউথ ওয়েল্‌স অর্থাৎ রাজ্য দলের হয়ে খেলার ডাক পেলেন তিনি। প্রথমে প্র্যাকটিস। সহ-খেলোয়াড়রা দূর গ্রাম থেকে সিডনিতে যাতায়াত করা ডনকে প্রথম-প্রথম পাত্তাই দিতেন না। ডন নিয়মিত আসতেন, প্র্যাকটিস করতেন, বাড়ি চলে যেতেন। ১৯২৭-'২৮ মরসুমে শেফিল্ড শিল্ডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই জানান দিলেন ডন, ১১৮ রানের সাড়াজাগানো ইনিংস খেললেন। এর পর

প্রতি ম্যাচেই রান। উপেক্ষার জায়গা নিল ঈর্ষা!

১৯২৮-এর ৩০ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে আবির্ভাব ঘটল তাঁর, বিপক্ষ ইংল্যান্ড। পরের ২০ বছর শুধু ক্রিকেটে ইতিহাস সৃষ্টি করার পালা। মুগ্ধতা আর বিস্ময়ে ভরা ৫২টি টেস্ট, দুটি ত্রিশত রান (বিশ্বের একমাত্র), ১০টি দ্বিশত রান (বিশ্বের একমাত্র) এবং ১৭টি শতরানসহ মোট রান তাঁর ৬৯৯৬।

ব্রাডম্যানের রানের ধারাবাহিকতা অবিশ্বাস্য! তিনি শতরান করেছেন গড়ে প্রতি ২.৭৮ ইনিংস অন্তর। এবং একটি শতরান করতে সময় নিয়েছেন গড়ে ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। টেস্ট ক্রিকেটে দেখা গেছে গোটা অস্ট্রেলিয়া দলের মোট রানের ২৬ শতাংশ এসেছে একা ব্রাডম্যানের ব্যাট থেকেই। ১৯৩০-এর স্মরণীয় ইংল্যান্ড সফরে তিনি পাঁচ টেস্টের সিরিজে করেছিলেন ৯৭৪ রান, এর মধ্যে আছে তিনটি 'ডাবল সেঞ্চুরি'। হেডিংলেতে জীবনের সর্বোচ্চ ৩৩৪ রান করেন; প্রথম শতরানটি আসে প্রথম দিনে লাঞ্চের আগে, ২১৪ মিনিটে দ্বিশত রান, এবং দিনের শেষে করেন ৩০৯ রান—এখন পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় এই রানের কাছাকাছি যেতে পারেননি! শুধু এই একবারই নয়, জীবনে আরও চারবার টেস্ট সিরিজে তিনি ৭০০-র বেশি রান করেন। ১৯৪৮ সালে জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে ব্যাটিং গড় ১০০ হওয়ার জন মাত্র চার রান দরকার ছিল ডনের। কিন্তু ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা সার ডনকেও ছাড়েনি। ইংল্যান্ডের অনামী বোলার এরিক হলিসের বলে খেলতে নেমেই দ্বিতীয় বলে বোল্ড হলেন ডোনাল্ড। অস্ট্রেলীয়রা এখনও বিশ্বাস করেন, টেস্টে শেষ বার ব্যাট করতে নামার সময় ডনের চোখ জলে ভিজে গিয়েছিল। বল ভাল করে দেখতেই পাননি। তাই স্টাম্প ছিটকে যায়।

১৯৩৩-এ শুধু 'রান মেশিন' ডোনাল্ড ব্রাডম্যানকে আটকানোর জন্য ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন ঘৃণ্য চক্রান্ত করে বের করেছিলেন যা 'লেগ সাইড থিয়োরি' যা 'বডিলাইন' সিরিজ নামে পরিচিত। শরীর লক্ষ করে বল করো। ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড ছিলেন জার্ডিনের অস্ত্র। ব্রাডম্যান তেমন রান পাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিখুঁত ব্যাটিং টেকনিকের ফলে তাঁকে আহতও করা যায়নি। 'খুনি বোলার' লারউডও মুগ্ধ হয়েছিলেন ডনের ব্যাটিং-এ। বলেছিলেন, "বল হাতে ওরা আমাকে খুনি বলত। কিন্তু ব্যাট হাতে ব্রাডম্যান যে ভাবে বোলারদের খুন করত, তার সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা হয় না।"

কলকাতায় এসেছিলেন সার ডোনাল্ড

ভারতের বিপক্ষে খেললেও ভারতের মাটিতে কোনওদিনই ব্যাট হাতে নামেননি ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। এই নিয়ে তাঁর মনে গভীরতম বেদনাও ছিল। মৃত্যুর আগেও তিনি প্রতিদিন যে হাজার হাজার 'ফ্যানমেল' পেতেন তার বেশ কিছু যেত এই ভারত থেকেই। ফলে ভারতের প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান ছিল। ভারতে খেলতে পারেননি বলে কলকাতার এক ভক্তকে দুঃখ করে লিখেছিলেন, "আমরা সবাই যা করতে চাই, সবসময় তা করে উঠতে পারি না।" ভারতে খেলতে না পারলেও এদেশে, বিশেষত কলকাতায় তিনি যে কতখানি জনপ্রিয় তা টের পেয়ে গেছেন সার ডন। ১৯৫৩-তে, খেলা ছাড়ার পর তিনি এবং লেডি ব্রাডম্যান লন্ডন যাওয়ার পথে কলকাতায় একবার পা রেখেছিলেন। তাঁদের নায়ককে দেখার জন্য কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা তখন উত্তেজিত। উপস্থিত ছিলেন এই রাজ্যের ক্রিকেট কর্মকর্তারা এবং প্রাক্তন বিশিষ্ট খেলোয়াড়েরা। সব মিলিয়ে দর্শকের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, 'পুলিশ-কর্ডন' ভেঙে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে ডনকে সৈন্যবাহিনীর গাড়িতে চাপিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ড টুর 'কভার' করতে যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে নেমেছিলেন সার ডন। সেখানে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের তৎকালীন প্রধান কর্তা পঙ্কজ গুপ্ত।

ডনকে আউট করা আমার জীবনের সেরা ঘটনা : বিজয় হাজারে

সার ডন ব্রাডম্যানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারের আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম জীবিত খেলোয়াড় হলেন বিজয় হাজারে। তিনি বলেছেন, "আমি ভাগ্যবান যে, সার ডনের বিপক্ষে খেলেছি। আমাদের বিপক্ষে তাঁর রানের ফুলঝুরি আমি দেখেছি। কিন্তু আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে অ্যাডিলেড টেস্টে দুই ইনিংসেই আমি শতরান করার পর ব্রাডম্যানের আন্তরিক অভিনন্দন। নিজের ফিল্ডিং পজিশন ছেড়ে এগিয়ে এসে তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। ক্রিকেটের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে পাওয়া এই স্বীকৃতি আজও আমার সেরা প্রাপ্তি।" তবে বিজয় হাজারের জীবনের সেরা ঘটনা ব্রাডম্যানকে আউট করা, একবার নয়, দু'বার। মিডিয়াম পেসার হাজারে ব্রাডম্যানকে সিডনি এবং অ্যাডিলেডে আউট করেছিলেন। সিডনিতে ডন করেছিলেন মাত্র ১৩, অ্যাডিলেডে অবশ্য ভারতের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ২০১। সিডনির আউট সম্বন্ধে হাজারের কথা, "আমি সাধারণত আউট সুইঙ্গার বল করি। কিন্তু ওই ক্ষেত্রে বল করেছিলাম অফ কাটার। বল প্যাড এবং ব্যাটের ফাঁক দিয়ে উইকেটে লাগে। একটা বেল ৬০ গজ উড়ে গিয়ে পড়েছিল।" ব্রাডম্যানকে এভাবে আউট করতে পেরে হাজারে এখনও উচ্ছ্বসিত।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ব্রাডম্যান মিউজিয়ামে প্রতি বছর আসেন ৫০ হাজার দর্শক

সিডনি থেকে বাউরালের ব্রাডম্যান ট্রাস্ট মিউজিয়ামে যেতে সময় লাগে গাড়িতে ৯০ মিনিট। এতে আছে একটি চমৎকার প্যাভিলিয়ন, এটির উদ্বোধন হয় ১৯৮৯ সালে। খেলোয়াড়দের জন্য এটি নির্দিষ্ট। আছে একটি মাঠও। এখানে নানা দলের মধ্যে খেলা হয়। বিদেশ থেকে দল এসেও খেলে যায় এই মাঠে। তরুণ ক্রিকেটারদের কোচিং দেওয়া হয় এখানে, স্কলারশিপের ব্যবস্থাও আছে। প্যাভিলিয়নের পেছনেই আছে মিউজিয়াম। এটির উদ্বোধন হয় ১৯৯৬ সালে। এতে আছে তিনটি বড় ধরনের গ্যালারি, বিশেষভাবে ব্রাডম্যানের জিনিসপত্র নিয়ে একটি এগজিবিশন গ্যালারি, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম শপ, ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা জায়গা। একটি গ্যালারিতে ক্রিকেট ইতিহাসের পুরো বিবরণ আছে। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ক্রিকেট শুরু হয়েছে, তার ইতিহাস, ক্রমবিবর্তন। ছবি, ক্লিপিংস, মিউজিয়াম চার্টের সাহায্যে এটা তুলে ধরা হয়েছে। ব্রাডম্যান গ্যালারিতে তাঁর ব্যবহৃত টুপি, ব্যাট, গ্লাভ্স সংগৃহীত হয়েছে। তবে তাঁর অনেক কিছু পাওয়াও যায়নি। মিউজিয়ামের ডিরেক্টর রিচার্ড মালভাঙ্গি জানিয়েছেন, এর জন্য দায়ী ব্রাডম্যানই। তিনি নানা 'চ্যারিটি'র সাহায্যার্থে অকাতরে তাঁর ব্যবহৃত ব্যাট, টুপি দিয়ে দিতেন। সেগুলি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ হত। একবার তাঁর একটি ঐতিহাসিক টুপি পাওয়া গিয়েছিল ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ওয়াল্টার রবিন্সের ছেলের সংগ্রহ থেকে। তাঁকে ডন এটি উপহার দেন। মিউজিয়ামে অবশ্য অনেক উপহারসামগ্রী কিনতে পারা যায়। তাতে আছে ডনের সই, ছবি, স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড, পেনদানি। এর থেকে সংগৃহীত অর্থ ক্রিকেটের উন্নতিতেই লাগানো হয়। সেটাই সার ডনের ইচ্ছে ছিল।

ডোনাল্ড ব্রাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ ম্যাচটি খেলেন ক্যানবেরায়, ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এম.সি.সি-র বিপক্ষে প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়ে একদিনের চ্যারিটি ম্যাচে। ব্রায়ান স্ট্যাথামের একটা গুড লেংথ বল তাঁর ব্যাটে এবং পায়ে লেগে স্টাম্পে আঘাত করে। মাত্র চার রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন ডন। সেই শেষ। আর কখনও অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত টুপি পরে মাঠে নামেননি তিনি। এর আগে অবশ্য ১৯৪৯-এ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ডন। অব্যবহিত পরেই 'নাইটহুড' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। হয়েছেন সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। প্রায় চার দশক ধরে তিনি থেকেছেন কখনও নির্বাচক কমিটির সদস্য, কখনও চেয়ারম্যান, নির্বাচক বা ট্রাস্টি। যতদিন পেরেছেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের সেবা করে গিয়েছেন সার ডন।

'রান মেশিন' ডোনাল্ড ব্রাডম্যান সারা জীবনে মোট ৬৬৯ টি ম্যাচে রান করেছেন ৫০৭৩১; গড় ৯০.২৭। রানের এই 'এভারেস্ট'-এর মাঝে আছে প্রচুর রেকর্ড। ১৯২৯-'৩০ মরসুমে সিডনিতে কুইনসল্যান্ডের বিপক্ষে করেন অপরাজিত ৪৫২ রানের অনবদ্য রেকর্ড, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০ বছর ওই রেকর্ড অটুট ছিল। মাইনর ক্রিকেট ম্যাচে একবার তিন ওভারে শতরান করেছিলেন তিনি যেখানে ২২টি বলেরসম্মুখীন হন, সেখানে তাঁর সহ-খেলোয়াড় মাত্র দুটি বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আরও কত চমকপ্রদ, বিস্ময়কর রেকর্ড নানা পর্যায়ে করেছেন সার ডন। রানের এই ধারাবাহিকতা, রেকর্ডের বিশালতা কোন দক্ষতার জোরে করতে পেরেছিলেন ডোনাল্ড ব্রাডম্যান? তাঁর ব্যাটিং টেকনিক ও ব্যাটিং স্টাইল সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত স্পিনার বিল ও'রিলির মূল্যায়ন, "ব্রাডম্যানের টেকনিকের সঙ্গে অন্য কারও তুলনাই চলে না। বোলারকে আউটের কোনও সুযোগই দিতেন না ডন। তিনি যখনই মাঠে আসতেন, তখনই শুরু করতেন তাঁর রাজকীয় ব্যাটিং স্টাইলের প্রদর্শন। বহু বোলারকে আমি বলতে শুনেছি, ল অব অ্যাভারেজের নিয়মে কোনও না কোনও সময়ে ব্রাডম্যান ভুল করবেনই। তাঁদের আশা কিন্তু কোনও দিনই পূরণ হয়নি। প্রত্যেকটা ডেলিভারির জন্য তাঁর আলাদা আলাদা শট তৈরি থাকত। এমনকী একটি বলের জন্য একাধিক শটও তৈরি রাখতে পারতেন তিনি। "বলা বাহুল্য, বিল ও'রিলিকে সার ডন তাঁর খেলা বিশ্বসেরা বোলার বলেই মনে করতেন। প্রিন্স দলীপ সিংহজির মত, "অনুমান ক্ষমতা, গেম সেন্স, ফুটওয়ার্ক, কবজির নমনীয়তা, চমৎকার সময়জ্ঞানে ডন সকলের চেয়ে আলাদা। ব্রাডম্যান হচ্ছেন রেসের গাড়ি, বাকিরা ঘোড়ার গাড়ি।" বিনু মাঁকড়ের মতে, "বোলারের মন বোঝার ক্ষেত্রে ডনের কোনও তুলনা ছিল না। প্রায় সব সময়ই তিনি ঠিক হতেন।" দাতু ফাদকার বলেছিলেন, "আমি ওয়ালকট, উইকস্, হাটন এবং কম্পটনকে বল করেছি। এঁরা অসাধারণ ব্যাটসম্যান ছিলেন। তথাপি এঁদের বিপক্ষে একটা গেম-প্ল্যান স্থির করা যেত, কিন্তু ব্রাডম্যানের বিপক্ষে কোনও প্ল্যানই নেওয়া যেত না। তিনি এত দেরিতে খেলতেন যে, সব প্ল্যানই ভেস্তে যেত।" সার ডনের অন্যতম প্রিয় খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের কথা, "তিনি সহজ উইকেটের রাজা ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছেয় বল সারা মাঠ ঘুরত, বোলারের ইচ্ছেয় নয়। নিজেকে ইম্প্রোভাইজ করা, আন অরথোডক্স শট মারার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর খেলায়। তাই তিনি কিংবদন্তি।" এ.জি. মোয়েমের 'ব্রাডম্যান' বইটির মুখবন্ধে আর্থার গিলিগান মন্তব্য করেছেন, "তিনি শুধু একজন অসাধারণ ব্যাটসম্যান নন, বুদ্ধিমান অধিনায়ক, তার চেয়ে বড় কথা মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।" সত্যি কথাই। এক সময় এই মানুষটির দিকেই চেয়ে থেকেছে অস্ট্রেলিয়া। তিনের দশকে 'গ্রেট ডিপ্রেশন' তথা অর্থনৈতিক মন্দায় যখন ভুগছে গোটা অস্ট্রেলিয়া, যখন যুবকদের চোখে শুধুই হতাশা, সেই সময় অস্ট্রেলীয়দের কাছে তাঁর ব্যাটিং, উপস্থিতি ছিল এক ঝলক বসন্তের হাওয়া। খেলাধুলোর প্রতি লোকের আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছিল, ক্রিকেট মাঠে লোকই হচ্ছিল না। তিনি তাঁর

টেস্টে সার ডনের রানের হিসেব

বছর	ম্যাচ	সর্বোচ্চ	শতরান	মোট রান	গড়
১৯২৮	২	১১২	১	২১০	৫২.৫০
১৯২৯	২	২২৩	১	২৫৮	৮৬.০০
১৯৩০	৬	৩৩৪	৪	৯৭৮	১২২.২৫
১৯৩১	৭	২২৬	৫	৯৫০	১০৫.৫৫
১৯৩২	৩	২৯৯*	২	৪০২	৪০২.০০
১৯৩৩	৩	৭৬	—	২৯৩	৪৮.৮৩
১৯৩৪	৫	৩০৪	২	৭৫৮	৯৪.৭৫
১৯৩৬	২	৮২	—	১২০	৩০.০০
১৯৩৭	৩	২৭০	৩	৬৯০	১৩৮.০০
১৯৩৮	৪	১৪৪*	৩	৪৩৪	১০৮.৫০
১৯৪৬	২	২৩৪	২	৪২১	২১০.৫০
১৯৪৭	৫	১৮৫	১	৪৫৭	৬৫.২৮
১৯৪৮	৮	২০১	৫	১০২৫	১১৩.৮৮
মোট	৫২		২৯	৬৯৯৬	৯৯.৯৪

* অপরাজিত

ক'বার কীভাবে আউট

বোল্ড	২৩ বার
কট	৩৯ ”
এল. বি. ডব্লিউ	৬ ”
হিট উইকেট	১ ”
রান আউট	১ ”
স্টাম্পড	০ ”
নট আউট	১০ ”
মোট	৮০ ”

টুকিটাকি

● অনেক নামেই পরিচিত ছিলেন ব্রাডম্যান। দ্য বয় ওয়ান্ডার, দ্য বয় ফ্রম বাউরাল, দ্য ডন ইত্যাদি নামে ডাকা হত তাঁকে। কিন্তু প্রথম ডাকনাম ব্রাডি।

*

● ব্রাডম্যানের প্রথম চাকরি বাড়ি-জমি কেনাবেচার সংস্থা, 'ডিয়ার অ্যান্ড ওয়েস্টবুক'-এ। এখানে তিনি সেক্রেটারি ছিলেন।

*

● সার ডন খুব ভাল টেনিস খেলতেন। অবসরের পর গল্ফও খেলতেন চুটিয়ে। তবে ক্রিকেটের বাইরে তাঁর সেরা পারফরম্যান্স স্কোয়াশে। ১৯৩৯-এ 'সাউথ অস্ট্রেলিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ' জেতেন ডন।

*

● ডন বল করেছেন খুবই কম। তাঁর সেরা বোলিং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩৫ রানে তিন উইকেট। ১৯৩০-এ কেমব্রিজের বিপক্ষে। অধিনায়ক হিসেবে ১২০টি ম্যাচে তিনি বল করেছেন মাত্র ৫২টি। সারা জীবনে ছক্কা মেরেছেন মাত্র ছ'টি, টেস্ট-জীবনে কদাপি ৯০-এর ঘরে গিয়ে আউট হননি ডন।

*

● টেস্টে ব্রাডম্যান সবচেয়ে দ্রুত দ্বিশত রান করেছেন ২১৪ মিনিটে, লিড্‌সে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩৪-এ। জীবনের সবচেয়ে বেশি সময়ে করা শতরান নটিংহামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই ১৯৩৮-এ, ১৪৪ রান করেন ২৪৫ মিনিটে।

*

● ব্রাডম্যানকে টেস্টে সবচেয়ে বেশিবার আউট করেছেন ইংল্যান্ডের বাঁ-হাতি স্পিনার হ্যাডলি ভেরেটি— আটবার। বিশ্বে আর কোনও বোলার তাঁকে এতবার আউট করতে পারেননি।

*

● টেস্টে এক সিরিজে সর্বাধিক রান করার কৃতিত্ব ব্রাডম্যানের— ৯৭৪,ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। সাত ইনিংসে তাঁর রান ছিল : ৮, ১৩১, ২৫৪, ১, ৩৩৪, ১৪, ২৩২। সালটা ১৯৩২।

*

● ডন ব্রাডম্যান জীবনে ১৬ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ছ'বার আউট হয়েছেন প্রথম বলে, তিনবার আউট হয়েছেন দ্বিতীয় বলে।

অনবদ্য ব্যাটিং দক্ষতায়, শিল্পের সৌকর্য প্রদর্শনে মাঠে দর্শক ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। অতি সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা ব্রাডম্যান উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন সাধারণ তরুণ দলকে। আমরাও বাধা অতিক্রম করতে পারব— এই মানসিকতা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি অস্ট্রেলীয় জাতিরও যে কত উপকার করেছিলেন তা সশ্রদ্ধচিত্তে পরবর্তীকালের বহু বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেছেন।

খেলার সময়েই 'কিংবদন্তি' শিরোপা পেয়েছেন

ভারতের বিপক্ষে ব্রাডম্যানের রানের গড় ১৭৮.৭৫

ভারত ১৯৪৭-'৪৮ মরসুমে প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এবং ওই সফরেই ব্রাডম্যানের ব্যাটিং দক্ষতা দেখতে পান ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খুবই পছন্দ করতেন ডন। প্রায়ই ভারতীয় ড্রেসিংরুমে আসতেন তিনি। তাঁকে কাছে পেয়ে উদ্বুদ্ধ হতেন তরুণ ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ সফরের মাঝপথেই খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "ব্রাডম্যানের সঙ্গে খেলতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। শুধু আমি নই, প্রত্যেক ভারতীয় খেলোয়াড়ই সৌভাগ্যবান। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যথার্থ একজন 'স্পোর্টসম্যান', প্রকৃত ভদ্রলোক।" ব্রাডম্যানও তাঁর খুশি গোপন করেননি। পরবর্তীকালে বলেছেন, "ওই সিরিজটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা মরসুম।" লালা অমরনাথ সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন : "নিজের দক্ষতা দারুণ। কিন্তু অহেতুক ঝুঁকি নেয়।" বিজয় হাজারের খেলাও খুব পছন্দ ছিল ডনের। বলেছিলেন, "কেতাবি নির্ভুল ক্রিকেট খেলে। স্ট্রোক মারায় দক্ষ।" ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও ডনের ব্যাট কিন্তু ঝলসে উঠেছিল তাঁদের বিপক্ষে। ছ'টি ইনিংসে ভারতের বিপক্ষে ডনের রান ৭১৫, চারটি শতরান। এর মধ্যে একটি দ্বিশতরান। মেলবোর্ন টেস্টে দু' ইনিংসেই তিনি শতরান করেন। তাঁর রানের গড় হয় ১৭৮.৭৫। সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তিনি করেন ১০৮১ রান, ছ'টি শতরান, গড় ১৩৫,১২। ওই মরসুমেই ভারতের বিপক্ষেই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ১০০তম শতরানটিও করেন। পরে এই স্মরণীয় ইনিংসটি যখন ফিল্ম করে লন্ডনে দেখানো হয়, তা দেখে বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক আর সি রবার্টসন-গ্লাসগো লিখেছিলেন : "ব্রাডম্যানের ১০০তম শতরানের ম্যাচে ৯৯ থেকে ১০০ যাওয়া দেখতে-দেখতে, ঐতিহাসিক এক ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি বলে আমিই রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম। ডনের মনে তা হলে কী হচ্ছিল!" তিনি লেখেন, "আমি আর-এক দারুণ দৃশ্যও দেখেছি। সে-সময় বল করছিলেন ভারতীয় বোলার কিষেণচাঁদ। তিনি এক হাতে বল করছিলেন আর অন্য হাত তালি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনিও।"

ডন। অবসরের পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে ডাকটিকিট ও মুদ্রা। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের পোস্ট বক্স নম্বর তাঁর অবিশ্বাস্য টেস্ট গড় রানের কথা মনে করেই রাখা হয়েছে ৯৯.৯৪। তাঁর জনপ্রিয়তা এতই তুঙ্গস্পর্শী হয়েছে যে, দিনে প্রায় ৬০০ ফ্যান মেল তিনি পেয়েছেন কিছু দিন আগে পর্যন্তও। এমনও হয়েছে, শুধু তাঁর নাম লিখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চিঠি। যথাসময়ে হাতে চিঠি পেয়েছেন ডন। এত জনপ্রিয়তা ভাঙানোর কোনও চেষ্টাই করেননি ডন। অবসরের পরবর্তী জীবনে শেয়ার, বাড়ি তৈরির ব্যবসা ইত্যাদিতে সময় দিয়েছেন। মাঝে-মাঝে ক্রিকেটের সভায় গেছেন, শেষের দিকে তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাপনই তিনি পছন্দ করেছেন। সমসাময়িক জ্যাক ফিঙ্গলটন অভিযোগ করেছিলেন, ডন একা একাই থাকতেন। ম্যাচের পর কারও সঙ্গে মিশতেন না, গল্পগুজব করতেন না। ফিঙ্গলটনের এই অভিযোগ ঠিক নয়। বিলাসিতা করতেন না ঠিকই, কিন্তু মিশতেন না একথা ঠিক নয়। তবে ম্যাচের পর হোটেলে ফিরে পিয়ানো বাজানোতেই তিনি বেশি আনন্দ পেতেন। পিয়ানো বাজানো তাঁর অন্যতম প্রিয় শখ ছিল। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর বেশি ছিল না। সেজন্য বিশিষ্ট সমালোচক নেভিল কার্ডাসকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন ভাল বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে

মুম্বাইয়ে অনুশীলনের সময় শোকস্তব্ধ আজকের অস্ট্রেলিয়ার দলের খেলোয়াড়রা

ফোটো : এ এফ পি

দিতে। খেলার পর সেই তালিকা অনুযায়ী কেনা বই তিনি পড়তেন। সাধারণ পরিবারের সন্তান ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এইভাবেই নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ। অসাধারণ ব্রাডম্যান নিজেকে কোনওদিনই সাধারণের বেশি কিছু ভাবেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার হিলটন একারম্যান এবং টনি গ্রেগ একবার অ্যাডিলেডে আসেন বিশ্ব একাদশের হয়ে খেলতে। অ্যাডিলেড এয়ারপোর্টে তাঁদের 'রিসিভ' করেন ছোট্টখাট্টো চেহারারা এক ভদ্রলোক। তিনি স্বাগত জানান তাঁদের এবং কফি খাওয়ার কথাও বলেন। ক্লান্ত দুই খেলোয়াড় তাঁর কথাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর হাতে তাঁদের ব্যাগ রাখেন, বাথরুমে যান চোখে মুখে জল দেওয়ার জন্য। ফিরে এসে তাঁকে নিয়ে 'কফিবারে' ঢোকেন। একথা সেকথার পর গ্রেগ জিজ্ঞেস করেন, স্থানীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না? মৃদু হেসে ভদ্রলোক জানান, স্থানীয় ক্রিকেটের তিনি একজন কর্তাব্যক্তি। এই কথা চলতে-চলতেই বারের 'সুইংডোর' খুলে ঢোকেন সোবার্স এবং বলেন, "সার ডোনাল্ড, আপনি কেমন আছেন?" প্রশ্নটি ওই ভদ্রলোককে। একথা শোনার পর লজ্জায় অধোবদন হয়ে যান টনি গ্রেগ। মৃদু হাসতে থাকেন সার ডন। নিজেকে আড়ালে রাখার এই খেলাতেও জিতে গেলেন ডন।

ক্রিকেটের ইতিহাসে সার ডনের কোনও তুলনা নেই। কিন্তু তিনি কাদের সেরা ক্রিকেটার মনে করতেন? দ্রুতগতির বোলারদের মধ্যে সেরা মনে করতেন ফাঙ্ক টাইসনকে, তবে সেটা জোরে বল করায়। বলের কাজে তাঁর মতে সেরা ছিলেন লারউড। তবে যেসব বোলারকে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে সেরা মনে করতেন বিল ওরিলিকে। সেরা অলরাউন্ডার তাঁর মতে অবশ্যই সার গারফিল্ড সোবার্স। এই প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে তাঁর সেরা ব্যাট্সম্যানের তালিকায় ছিল দুটি নাম ব্রায়ান লারা এবং সচিন তেন্ডুলকর। সেরা বোলার শেন ওয়ার্ন। অবসরের পর তাঁর মুখ থেকে উত্তরসুরির নাম জানার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করেছে সারা বিশ্ব। এতদিনেও তাঁর কীর্তির কাছাকাছি কেউ যেতে পারেননি, সুতরাং দ্বিতীয় 'ডন'-ও পাওয়া যায়নি। কিন্তু এত বছরের মধ্যে একজনকেই তিনি পছন্দ করেছিলেন। টিভিতে সচিন তেন্ডুলকরের খেলা দেখে তিনি স্ত্রী জেসিকে বলেছিলেন, "জেসি, দেখো দেখো এই ছেলেটার ব্যাটিং ধরনটা অনেকটা আমার মতো।" আবেগ আপ্লুত সচিন অবশ্য বারবার বলেছেন, যাঁর গড় ১০০-এর কাছাকাছি তাঁর সঙ্গে কারওরই তুলনা হয় না। তবে এটাও স্বীকার করেছেন, "সার ডনের প্রশংসাই আমার সেরা প্রাপ্তি।"

অনেক বোদ্ধা বলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত চার পেসারের সম্মুখীন হলে, সার ডনের এই গড় থাকত না। তাঁরা ভুলে যান বিল ভোস, হ্যারল, লারউডের মতো ভয়ঙ্কর বোলারদের সামলেছিলেন ডন। যে যুগে উইকেট ঢাকা থাকত না, ছিল না হেলমেটও, তথাপি আটকানো যায়নি ডনকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তাঁর জীবনের সেরা সময়ে ক্রিকেট খেলতে পারেননি তিনি, এ ছাড়া সারা জীবন জুড়ে অসুস্থতা তাঁকে তাড়া করেছে। ১৯৩৪-এ ইংল্যান্ড সফরের শেষের দিকে এতই কাবু হয়ে পড়েন যে, তাঁর বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পিঠের ব্যথা, দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যায় পড়ে এক সময় মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিলেন ডন। এসব কিছুই কিন্তু থামাতে পারেনি ডনকে। মাঠে নামলে তিনি একক, সম্রাট তিনি। পারিবারিক জীবনেও কম দুঃখ পাননি সার ডন। প্রথম সন্তান জন্মানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছে, মেয়ে শার্লিও জন্মেছিলেন পোলিও রোগ নিয়ে। ৬৫ বছরের সঙ্গিনী স্ত্রী জেসি মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। নিঃসঙ্গ হয়েছেন। কিন্তু নিজের অভিজাত্য ত্যাগ করেননি। 'ডন' নাম ভাঙাননি। এখানেও তিনি একাকী। মাঠ, মাঠের বাইরে সর্বত্র তিনি অনন্য। তিনি ডন ব্রাডম্যান।

বডিলাইন বল করেও আটকানো যায়নি ব্রাডম্যানকে

ক্রিকেটের কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯৩২-'৩৩-এর বডিলাইন সিরিজ। সেই সিরিজে লারউড একবারও গায়ে বল লাগাতে পারেননি ব্রাডম্যানের। লিখেছেন চন্দন রুদ্র

বডিলাইন সিরিজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন

বিশ্ব-ক্রিকেটে একজন কৃতী বোলার হিসেবে পরিচিত হতে পারতেন তিনি। বহুদিন পারতেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপিয়ে বেড়াতে। কিন্তু পারেননি। ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং কলঙ্কিত ঘটনা বডিলাইন সিরিজ। ক্রিকেট-দুনিয়ার অন্যতম সেরা বোলার হওয়া সত্ত্বেও এই একটি সিরিজই বোলার লারউডের সব কৃতিত্ব কেড়ে নিয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'খলনায়ক'। অন্য দিকে সদ্যপ্রয়াত ক্রিকেটের কিংবদন্তি ডন ব্রাডম্যান পেয়েছিলেন নায়কের সম্মান।

ক্রিকেট-ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ব্যাট্‌সম্যান হয়ে ওঠা সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান প্রথম বিদেশ সফরেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ক্রিকেট-প্রতিভা। ১৯৩০ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে প্রথমবার গিয়েই ঝলসে উঠেছিল তরুণ ক্রিকেটার ডন ব্রাডম্যানের ব্যাট। একাই অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ জিতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটের কাছে হার মেনেছিল ইংল্যান্ড। পাঁচ টেস্টের সাত ইনিংসে ১৩৯.১৪ গড়ে করেছিলেন ৯৭৪ রান। খেলেছিলেন একটি শতরান, দুটি দ্বিশত রান এবং একটি ত্রিশত রানের ইনিংস। লিড্‌সে ৩৩৪ রানের ইনিংস খেলতে গিয়ে একদিনেই করেছিলেন ৩০৯ রান। সেই অসাধারণ ইনিংস নিয়ে আজও আলোচনার শেষ নেই। ১৯৩১-'৩২ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে ৫-০তে সিরিজ হেরেছিল। এই সিরিজে ঘরের মাঠে ব্রাডম্যানের ব্যাট ছিল একই রকম বিধ্বংসী। দুটি শতরান এবং দুটি দ্বিশত রানের ইনিংস-সহ করেছিলেন ৮০৬ রান।

এ হেন সাফল্য যে-ব্যাট্‌সম্যানটির ব্যাটে, যিনি ঝড়ের গতিতে রান নিতে পারেন, অন সাইডে যাঁর ব্যাট কথা বলে, যিনি বোলারদের খুন করতেই বেশি ভালবাসেন, তাঁকে আটকানো সহজ কথা নয়। কিন্তু

ইংল্যান্ড-অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন ব্রাডম্যানকে আটকাতেই ছিলেন বদ্ধপরিকর। ১৯৩২-'৩৩ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্বে ছিলেন জার্ডিন। কোনও নমনীয়তা বা শিষ্টাচার ডগলাসের চরিত্রে ছিল না। যে-কোনওভাবেই হোক অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই সিরিজে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ব্রাডম্যান কোনও ভয়ঙ্কর ব্যাট্‌সম্যান নন, তাঁকেও থামিয়ে দেওয়া যায়। আগের সিরিজে ইংল্যান্ড বোলারদের একাই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন ব্রাডম্যান। জার্ডিন তাই বডিলাইন বোলিংয়ের ছক কষেছিলেন। সেই সময় দলে পেয়েছিলেন হ্যারল্ড লারউডের মতো একজন সত্যিকারের উঁচুমানের ফাস্ট বোলারকে। সঙ্গে ছিলেন আর-এক বোলার বিল ভোস। বিধ্বংসী বোলার লারউড আর ভোসকে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট্‌সম্যানদের শরীর লক্ষ্য করে তীব্র গতির শর্ট পিচ বল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন জার্ডিন। ওই সিরিজে উইকেট রক্ষার চেয়ে ব্যাট্‌সম্যানদের জীবনরক্ষাই বড় হয়ে উঠেছিল। লারউডের শরীর লক্ষ্য করে ছোড়া বল সামলাতে গিয়ে পাঁজরের ঠিক তলায় আঘাত পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক উইলিয়ম ম্যালড়ন উডফুল। আঘাত পেয়েছিলেন আরও অনেকেই। তবে যাঁকে উদ্দেশ্য করে জার্ডিন ওই আক্রমণ হেনেছিলেন সেই ব্রাডম্যানের রানের গড় ওই সিরিজে সামান্য কমলেও লারউডরা তাঁর গায়ে একবারও বল লাগাতে পারেননি। ব্রাডম্যান ছিলেন নিজের লক্ষ্যে অনড়।

সিডনিতে সিরিজের প্রথম টেস্টে দলে ছিলেন না ব্রাডম্যান। পরবর্তী চারটি টেস্টে ব্যাট করে একটি সেঞ্চুরিসহ ব্রাডম্যান করেছিলেন ৩৯৬ রান। আটটি ইনিংসে তিনি করেছিলেন ০ ও ১১৩, ৮ ও ৬৬, ৭৬ ও ২৪, ৪৮ ও ৭১। গড় ৫৬.৫৭। তিনিই ছিলেন অস্ট্রেলিয়া ব্যাট্‌সম্যানদের মধ্যে ব্যাটিং গড়ে শীর্ষে। লারউডের ওই বলের সামনে কোনও ব্যাট্‌সম্যানেরই থিতু হওয়া সম্ভব ছিল না। পরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররাই সে-কথা স্বীকার করেছিলেন। ব্রাডম্যান ছাড়া কেউই ওই সিরিজে অফসাইড থেকে রান তোলার কথা ভাবতে পারেননি। লারউড নিজেই বলেছিলেন, "ব্যাট হাতে মারমুখী ব্রাডম্যানের মতো বিধ্বংসী আর কেই বা আছেন?" তবুও নিজের ওই সাফল্যকে ব্রাডম্যান ব্যর্থতা বলেই মেনেছেন। পরে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "এর আগের সিরিজগুলিতে আমার পারফরম্যান্সের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কেন আমি এই সাফল্যকে ব্যর্থতা বলেছি। ভুলে যাচ্ছেন, বডিলাইন সিরিজে ক্রিকেট নয়, যুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধে আমার আরও বেশি সফল হওয়া উচিত ছিল।"

শেষ পর্যন্ত ৪-১ ফলে অ্যাশেজ জিতে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু পাঁচ টেস্টে একই কায়দায় বল করা এবং ছ'জন ফিল্ডার দিয়ে লেগ সাইডে ব্যাট্‌সম্যানকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে থাকার জন্য ক্রিকেট-ইতিহাসে ওই সিরিজটি 'বডিলাইন সিরিজ' নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কুখ্যাত এই সিরিজ জয় করে জার্ডিন নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু সম্মান তিনি পাননি। বরং হেলমেট, থাইপ্যাড, চেস্ট গার্ড ছাড়া ব্রাডম্যানের একক লড়াই এই মহান ক্রিকেটারকে খ্যাতি ও শ্রদ্ধার উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। বডিলাইন বিতর্ক রাজনৈতিক মাত্রাও পেয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'দেশের সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছিল। সংবাদপত্রে উঠেছিল সমালোচনার ঝড়। বডিলাইন নিয়ে পরে ছবি হয়েছে। কবিতা লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে অজস্র বইও।

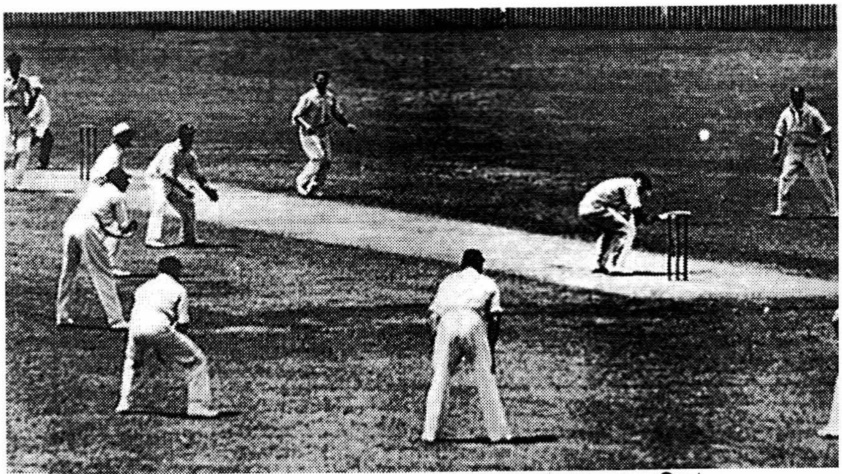

পুরনো অ্যালব্যাম : বডিলাইন সিরিজের একটি টেস্ট খেলা চলছে

বডিলাইন সিরিজে ইংল্যান্ড দলের অধিনায়কত্ব করে জার্ডিন যত না সমালোচিত হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন হ্যারল্ড লারউড। ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামশায়ারের এক খনি-শ্রমিকের ছেলে লারউড ভাগ্যচক্রে খনি-শ্রমিক না হয়ে হাতে তুলে নিয়েছিলেন ক্রিকেট-বল। ১৯২৪ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু করেন লারউড। দু'বছর পরই চলে আসেন ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে। দ্রুতগতির বোলার হিসেবে অল্পদিনেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ফেলেন। কিন্তু বিতর্কিত বডিলাইন সিরিজ লারউডের ক্রিকেট-জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ওই সিরিজে পেয়েছিলেন ৩৩টি উইকেট। গড় ১৯.৫১। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে উইকেট পান ১৪২৭টি (গড় ১৭.৫১)। এক মরসুমে শতাধিক উইকেট দখল করেন আটবার। সেরা বোলিং করেছিলেন ১৯৩১ সালে ট্রেন্ট ব্রিজে নটিংহ্যামশ্যায়ারের হয়ে কেন্টের বিরুদ্ধে। ৪১ রানে ন'জন ব্যাট্‌সম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ২১টি টেস্টে খেলে পেয়েছিলেন ৭৮টি উইকেট। গড় ২৮.৩৫। ব্যাটে রান করেছেন ৪৮৫। গড় ১৯.৪০। সর্বোচ্চ ৯৮। কিন্তু বডিলাইন সিরিজে লারউড এতটাই নিন্দিত হয়েছিলেন যে, এর পর আর কোনওদিনই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য ডাক পাননি। ১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া গেলে ইংল্যান্ডের দল নির্বাচন বৈঠকে একবারও লারউডের নাম ওঠেনি। ১৯৩৬ সালে কাউন্টি ক্রিকেটে বোলিং-গড়ে শীর্ষস্থান দখল করেও নয়। অথচ বডিলাইন-সিরিজের প্রকৃত খলনায়ক ডগলাস জার্ডিন এর পরও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক পদে থেকে গেছেন। সাধারণ খনি-শ্রমিকের সন্তান লারউড নিয়তির নির্মম বিধানে চলে গেছেন আড়ালে। প্রকৃত দোষী না হয়েও। বাউরালে ব্রাডম্যানের সংগ্রহশালায় আছেন সবাই, নেই কেবল লারউড।

ব্রাডম্যানের জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

দুর্ভাগ্য

১৯৩০-’৩১ সাল। অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়া খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তখন ন’রানে এক উইকেট। ক্রিজে এলেন অধিনায়ক ব্রাডম্যান। তারপর থেকে একটানা খেলেই গেলেন। নিজের রান ২৯৮। দলের ন’ উইকেট পড়ে গেছে। জোরে শর্ট মেরে দু’ রানের জন্য দৌড়লেন দু’জন, ব্রাডম্যান সময়মতো ক্রিজে পৌঁছতে পারলেও, নন-স্ট্রাইকার রানআউট হয়ে গেলেন, ফলে ২৯৯ রানে নট আউট থাকতে হল তাঁকে। সেটি ছিল ব্রাডম্যানের জীবনের দ্বিতীয় অপরাজিত ইনিংস। বডিলাইন সিরিজের ঠিক আগে ঘটেছিল এই ঘটনা। ব্রাডম্যান পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাঁর জীবনে খুব কম ঘটেছে।

ভারতে না আসার কারণ

ডন ব্রাডম্যান নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে অনেকবারই অসুস্থ হয়েছেন। দু’-তিনবার এত অসুস্থ হয়েছিলেন যে, স্ত্রী জেনিকে যেতে হয়েছিল তাঁর কাছে সেবা করার জন্য। ব্রাডম্যানের ছিল সমুদ্রপীড়া। তিন এবং চারের দশকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে দল আসত জাহাজে। কিন্তু ব্রাডম্যান জাহাজে চেপে ভারতে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁর সি-সিকনেসের জন্য। সেই কারণে ইচ্ছে থাকলেও ক্রিকেট-জীবনে কোনওদিন ভারতে আসতে পারেননি তিনি। ভারতের মাটিতে না খেলার আক্ষেপ ব্রাডম্যানের রয়ে গেছে সারাজীবন।

চোখে দেখা সেরা ইনিংস

গত শতকের তিনের দশক। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলছে অস্ট্রেলিয়া। একটি টেস্ট খেলা চলাকালীন খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন ডন ব্রাডম্যান। ক্রিজে তখন খেলছেন স্ট্যানলি ম্যাকেব। মাঠ ছাড়ার সময় ম্যাকেবকে কিছু নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন দলনায়ক ডন। প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়ে খেলোয়াড়দের ব্যালকনিতে ডেকে আনেন তিনি এবং বলেন, “দেখো ম্যাকেব আজ যে ইনিংস খেলছে এটা ত্রুটিহীন, অসাধারণ।” পরবর্তীকালে ম্যাকেবের সেই ইনিংসটিকে নিজের দেখা সেরা ইনিংস বলে বর্ণনা করেন সার ডন ব্রাডম্যান।

প্রসঙ্গ বডিলাইন

১৯৩২-’৩৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত বডিলাইন সিরিজ। বডিলাইনের প্রবর্তক ছিলেন ইংল্যান্ডের দলনায়ক ডগলাস জার্ডিন। হ্যারল্ড, লারউড ও বিল ভোসের সাহায্যে তিনি দমাতে চেয়েছিলেন ডন ব্রাডম্যানকে। কিন্তু বডিলাইন সিরিজে (ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ করে বোলিং) মাত্র একবারই বল ছুঁতে পেরেছিল ব্রাডম্যানের শরীর। সেই সিরিজে ডনের ব্যাটিং গড় ছিল ৫৬-র ওপরে। শতরান ছিল একটি। অবশ্য শূন্যও করেছিলেন। ব্রাডম্যানের দক্ষতা ও নিপুণতার কাছে ব্যর্থ হয়েছিলেন জার্ডিন, লারউড, ভোসের সম্মিলিত চেষ্টা। সিরিজ শেষে জার্ডিন বা লারউড অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন ডন ব্রাডম্যানের।

ব্রাডম্যানের চোখে সেরা

সেরা ব্যাটস্‌ম্যান—স্ট্যান ম্যাকেব।
সেরা ফাস্ট বোলার—ফ্র্যাঙ্ক টাইসন।
সেরা অলরাউন্ডার—সার গ্যারি সোবার্স।

বর্তমান প্রজন্মের সেরা : ব্রাডম্যানের চোখে

সেরা ব্যাটস্‌ম্যান—সচিন তেন্ডুলকর, ব্রায়ান লারা।
সেরা স্পিন বোলার—শেন ওয়ার্ন।
সেরা অধিনায়ক—স্টিভ ও’।

শূন্যের ব্যাখ্যা

ইংল্যান্ডে কেনসিংটন ওভালে জীবনের শেষ ইনিংসে এরিক হোলিসের বলে শূন্য রানে বোল্ড আউট হন সার ডন ব্রাডম্যান। নিজের শূন্য রানে আউট হওয়ার প্রসঙ্গে ব্রাডম্যান বলেছেন, “সেদিন (১৯৪৮ সালের অগস্ট মাস) যখন জীবনে শেষবারের মতো ব্যাট হাতে নামছি, দর্শকমণ্ডলী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সহযোদ্ধারা ব্যালকনিতে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আর ইংল্যান্ডের প্লেয়াররা মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে গার্ড অব অনার জানাচ্ছে—সেই দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি, চোখে জল এসে যায় আমার। ফলস্বরূপ ক্রিজে হোলিসের বল দেখতে পাইনি। তাই প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হই।” উল্লেখ্য, ওই ইনিংসে চার রান করতে পারলেই ডন ব্রাডম্যানের গড় দাঁড়াত ১০০।

সঙ্কলন : সুজন ঠাকুরতা

ধা রা বা হি ক

আগে যা ঘটেছে : রাজারাম চৌধুরী বৈশালী এবং বিক্রমশীলায় খননকার্যের সময় কিছু স্বর্ণমুদ্রা, একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি এবং এক সুবর্ণচক্র সরিয়ে রেখেছিলেন। এখন লালজি ভিমানি সেগুলো পাচার করতে চান। ধর্মচক্রটি নিখোঁজ। পাণ্ডব গোয়েন্দা নেমেছে ধর্মচক্র উদ্ধারের কাজে। লালজি ভিমানির বাড়ি থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফিরে এল বাড়িতে, সঙ্গে মুক্ত বীরবাহাদুর। পুলিশ গেল রাজারামবাবুর বাড়িতে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবস্থা বুঝে পৌঁছে গেল সাহেবগঞ্জে। রাজারামবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে অনু থাকে সেখানে। অনু সঙ্গী হল ওদের, সবাই মিলে চলল বিক্রমশীলা বেড়াতে। পীরপৈঁতিতে একটা খাদের মধ্যে বাবলু আবিষ্কার করল অনুকে। গাড়ি ছুটছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। একটু অমনোযোগী হতেই অনু পালাল গাড়ি থেকে। সে আশ্রয় নিল পাহাড়ে আদিবাসীদের ভেতর একটি ঘরে। গভীর রাতে তৃষ্ণার্ত অনু ঝরনার জল নিয়ে এসে দেখল বাবলুকে। ঘরে রান্নার জন্য—চাল, আলু, ডাল সবই আছে। কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। বাবলু আর অনু একসঙ্গে বের হল জল আনতে। ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে দেখল, ফাদারের কবরের কাছে কে একজন কম্বলমুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে চোর ভেবে ওদের দুজনকে তাড়া করেছে গ্রামবাসীরা। সবার হাতে ধারালো অস্ত্র। গ্রামের কুকুরগুলো ছুটে আসছে ওদের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ঘরের ভিতর থেকে কে একজন বাবলুকে টেনে নিল ঘরের ভেতর। তারপর...

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

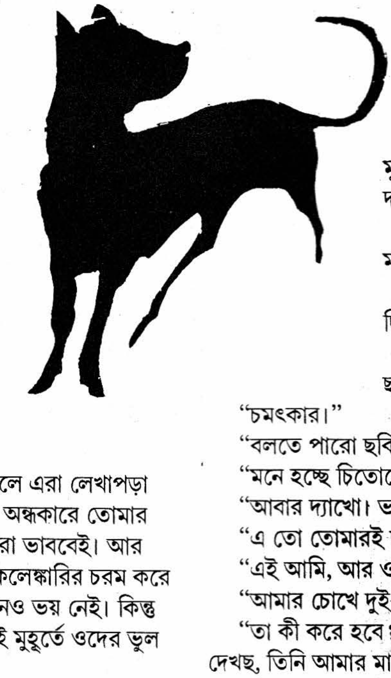

২৯

বাবলু বলল, "মরতে আমি ভয় পাই না।" বলেই টান হয়ে উঠে দাঁড়াল বাবলু।

গান্ধারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "কই ডাকো, চুপ করে আছ কেন? না পারলে বলো আমিই ডাকি।"

গান্ধারী শিউরে উঠল বাবলুর কথায়। বলল, "চুপ। অ্যায়সা মাৎ করো। এতে তোমার আমার দু'জনেরই বিপদ।"

বাবলু চুপ করল।

গান্ধারী বলল, "গ্রামের মানুষরা খারাপ নয়। আসলে এরা লেখাপড়া শেখেনি তো, তাই এদের বোধশক্তি খুব কম। রাতের অন্ধকারে তোমার মতো কাউকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখলে চোর ওরা ভাববেই। আর সেরকম ধারণা ওদের মাথায় একবার চেপে বসলে কেলেঙ্কারির চরম করে দেবে ওরা। না হলে ওদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও ভয় নেই। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে তুমি এসে পড়েছ তাতে করে এই মুহূর্তে ওদের ভুল কিন্তু ভাঙানো যাবে না।"

"বেশ। এবার তা হলে আমাকে বিদায় দাও। মনে হচ্ছে ওরা এবার হাল ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়েছে।"

"এখনই নয়। সময় হলেই তোমাকে আমি যেতে বলব। তবে একটা কথা বলে রাখি, তুমি যা যা বলেছ, তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি। আর সেজন্যই তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "আমাকে তোমার বিশেষ প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ। তার কারণ, আমার একটি কাজের জন্য আমি তোমাকে পেতে চাই। মনে হয় সে কাজটা তুমিই করে দিতে পারবে।"

"কী কাজ?"

"তার আগে এই প্রদীপের আলোয় আমার মুখখানা তুমি খুব ভাল করে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

"অনেক আগেই দেখেছি তোমাকে। তোমার মতো মেয়ের মুখ দেখতে আলোর দরকার হয় না।"

"এবার তা হলে ওই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

বাবলু এতক্ষণ লক্ষ করেনি ছবিটাকে। এবার ছবির খুব কাছে গিয়ে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "চমৎকার।"

"বলতে পারো ছবিটা কার?"

"মনে হচ্ছে চিতোরের রানি পদ্মিনীর।"

"আবার দ্যাখো। ভাল করে দেখে বলো।"

"এ তো তোমারই ছবি। কী সুন্দর!"

"এই আমি, আর ওই ছবির আমি, দু'য়ের মধ্যে কোনটা বেশি সুন্দর?"

"আমার চোখে দুই-ই সমান।"

"তা কী করে হবে? দুই কখনও এক হয়? ওই ছবির মধ্যে যে আমাকে দেখছ, তিনি আমার মা।"

"ওঁর মধ্যে আমি তো তোমাকেই দেখছি।"

"আসলে মায়ের মুখের আদলটা আমিই পেয়েছি।"

"তোমার মা কোথায়?"

গান্ধারীর চোখ দুটি এবার জলে ভরে এল। বলল, "আমার মা বেঁচে নেই।"

বাবলু স্নেহভরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে এলে গান্ধারী পিছিয়ে গেল। তেমনই গম্ভীরভাবে বলল, "কোনওরকম অছিলা নিয়েই আমাকে ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা তুমি করবে না। প্রয়োজনে আমি তোমার পায়ে পড়ব। কিন্তু তুমি অটল থাকবে। তবেই তো পৌরুষ জাগ্রত হবে তোমার। সব ছেলেরই এমন আদর্শ হওয়া উচিত।"

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক সম্পাদিত

by A Group of 20 Paper Setters

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

MADHYAMIK ENGLISH SAHAYIKA

মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা

মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা

মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই মাধ্যমিকে লেটার মার্কস পেতে হলে বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সহায়িকা

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান সহায়িকা

মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা

মাধ্যমিক ঐচ্ছিক মৎসচাষ সহায়িকা

প্রান্তিক

স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : ৩৫০-৯৩৫১, ৩৫২-৬৭১২

PRASA/2000

বাবলু বলল, "আয়্যাম সরি।"

"থ্যাঙ্কস।" বলে নিজেই নিজের চোখের জল মুছে বলল, "মা'ই আমার জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বজ্রের মতো কঠিন হতে শিখিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলে আমি হয়তো অন্য মেয়েদের মতোই হতাম।"

বাবলু বলল, "তোমার মায়ের কোনও অসুখ করেছিল?"

"না। শিবরাত্রির দিন গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে বটেশ্বরের পুজো দিতে দিয়েছিলেন মা। সেই যে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। কয়েকদিন পরে বিক্রমশীলার খাদানের কাছে এক জায়গায় মায়ের মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।"

শিউরে উঠল বাবলু, "সে কী!"

"এই ব্যাপারে আমি একজনের বদলা নিতে চাই। আমার একার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলেই সেটা সম্ভব হতে পারে।"

"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। কিন্তু কার ব্যাপারে বদলা নিতে চাও সেটা তো আমার জানা দরকার।"

"অবশ্যই। সে শুধু আমার নয়, তোমাদেরও শত্রু। একটু আগেই তার নাম তোমার মুখে শুনলাম।"

"কে তিনি? লালজি ভিমানি?"

"না। তার নাম বিন্ধ্যাচল রাম।"

বাবলু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গান্ধারীর মুখের দিকে চেয়ে।

গান্ধারী না হেসে তেমনই গম্ভীর মুখে বলল, "কী দেখছ অমন করে?"

বাবলু বলল, "তোমার ভেতরের আগুনটাকে। তোমরা মেয়েরা আমার চোখে এক পরম বিস্ময়। আমরা তোমাদের বাইরের রূপটাকেই দেখি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে মহাশক্তি লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান আমরা কেউই রাখি না।"

"শোনো বাবলু, ওইসব তত্ত্বকথা শোনবার সময় আর ধৈর্য আমার কোনওটাই নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়া। তুমি বা তোমার দলের ছেলেমেয়েরা যা, তাতে তোমরাই পারবে এই কাজে আমাকে সহায়তা করতে। ওই যে তোলা ভোলা ইত্যাদি যাদের নাম তুমি করলে, ওরাও ওই বিন্ধ্যাচল ওপড়াতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "আমার কথাগুলো যদি মন দিয়ে তুমি শুনে থাকো তা হলে নিশ্চয়ই জেনেছ শুধু লালজি ভিমানি নয়, বিন্ধ্যাচল রামও আমাদের টার্গেট। অতএব ওই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

গান্ধারী বলল, "এখন রাত তিনটে। তার ওপরে নিশুতি রাত। গ্রামের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রাতেই আমি তোমাকে গোপনে নিয়ে যাব বিন্ধ্যাচলের ডেরায়।"

"সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূরে?"

"দূর আছে। জঙ্গলের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসের আড্ডা। আড্ডা কথাটার মানে এখানে ঠেক। রামবিলাস অনেক ট্রান্সপোর্টের মালিক। ওইখান থেকে দিকে দিকে ট্রাক যায় ব্যাপারিদের জিনিস আনতে। ওই ট্রাকেরই একটাকে ম্যানেজ করে আমাদের যেতে হবে আন্তিচক গ্রামে। বিন্ধ্যাচল রাম ওখানেই আছেন। উনিই ওখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

বাবলু বলল, "তবে যে শুনেছিলাম উনি কহলগাঁওতে থাকেন।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কহলগাঁওতেও ওঁর বিশাল প্রাসাদ। গঙ্গার খুব কাছেই। তবে কিনা আন্তিচকেই উনি থাকেন ইদানীং। জমিদার লোক। চাষবাসের দেখাশোনা করেন। সেইসঙ্গে চুরি ডাকাতি থেকে নানারকম অসামাজিক কাজ।"

"কিন্তু এইভাবে আমাকে নিয়ে যে তুমি চলে যাবে, কাল সকালে এই ঘরের মধ্যে যখন তোমাকে দেখা যাবে না, তখন তোমার বাবা বা অন্যেরা চিন্তা করবেন না?"

"আমার ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে যেতে বলছি তুমি চলো। তা ছাড়া কাল সকাল হওয়ার আগে তোমাকে তো এখান

থেকে এমনিই যেতে হবে।"

"আমিও যাওয়ার জন্য তৈরি। শুধু যাওয়ার আগে অনুর খোঁজে আর একবার ওই খাদের কাছে যেতে চাই। যদি ও ওই দুর্বৃত্তদের কবলে না পড়ে থাকে তা হলে ওকে তো উদ্ধার করতেই হবে। বেচারি এতক্ষণে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে হয়তো। আমার পিস্তলটাও আমি খুইয়েছি ওখানেই, তাই—।"

গান্ধারী বলল, "তোমার পিস্তলের জন্য আমি চিন্তা করছি না, তবে অনুরাধার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব। আগে চলো ওকেই উদ্ধার করি ওই খাদের ভেতর থেকে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আসবে কিন্তু। জ্যোৎস্নার রাত। পথেও কোনও অসুবিধে হবে না।"

ওরা দু'জনে ঘরে তালা লাগিয়ে পথে বের হল। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল খাদের দিকে।

অনু সঙ্গে থাকায় কুকুরগুলো আর অযথা চেঁচামেচি করল না। বরং কিছুটা পথ ওদের সঙ্গেও এল।

খানিক আসবার পর একটি ছোটখাটো মেটে ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। বাবলুকে একটু আড়ালে সরে যেতে বলে গান্ধারী সেই ঘরের দরজায় টকটক করে শব্দ করল।

ঘরের ভেতর থেকে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এলে তার হাতে চাবি দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "চলো।" যেতে যেতে বলল, "ওর নাম গোপলা। আমার অনেক কাজ করে দেয় ও। চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম ওটা বাবুজিকে দিয়ে দিতে, আর আমার জন্য চিন্তা না করতে। আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে একবার ভাগলপুরে যেতেই হচ্ছে।"

"সে কী! তোমার বাবা জানতে চাইবেন না কেন এবং কী প্রয়োজনে তুমি গেলে?"

"না। তার কারণ মন গেলে আমি কখনও-সখনও হঠাৎই চলে যাই।"

"এত ভোরে গেছ কখনও?"

"দু-একবার গেছি। তার বেশি নয়।" বলে মৃদু হেসে বলল, "আসলে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ওপর গ্রাম্যরা কোনও ভরসা রাখে না। কেননা ছেলেমেয়েরা স্কুল অথবা কলেজে পড়লে বিশেষ করে যদি বাইরে থেকে পড়ে তবে ওদের গর্বের শেষ থাকে না। আর কাজেই ওরা ছেলেমেয়েদের সিদ্ধান্তকেই খুব বড় বলে মনে করে।"

বাবলু বলল, "বাঃ, এ তো খুব ভাল নিয়ম। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা একটা দেওয়াই থাকে।"

"তবে মেয়েদের ছেলে-বন্ধুকে ওরা খুব একটা ভাল চোখে দ্যাখে না। ইদানীং তাও মেনে নিচ্ছে।"

ওরা নিশ্চিন্ত মনে একটু দ্রুত পা চালিয়ে একসময় সেই খাদের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

গান্ধারী একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল। ভালুক বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর অবস্থিতি কাছাকাছি কোথাও আছে কি না তা ও বাতাসে টের পায়। কিন্তু সেরকম কোনও সম্ভাবনা কোথাও নেই দেখে ওরা খাদের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা খুব ভালভাবে দেখল একবার।

বাবলু ডাকল, "অনু!"

গান্ধারী ডাকল, "অনুরাধা!"

কোনও সাড়া এল না ভেতর থেকে।

বাবলু বলল, "মেয়েটাকে ওরা তা হলে নিয়েই গেছে।"

গান্ধারী বলল, "ও যদি ওদের হাতেই পড়ে থাকে ওরা তা হলে ওকে নিয়ে রামনিবাসেই রাখবে।"

বাবলু বলল, "রামনিবাসটা কোথায়?"

"রামনিবাস আস্তিচকেও আছে, কহলগাঁওতেও। তবে কি না আস্তিচকেই নিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ছোট্ট পাহাড়িয়া গাঁও। কারও নজরে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

"আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।"

"কী কথা?"

"আমাদের শত্রুতা লালজি ভিমানির সঙ্গে। তাই বিন্ধ্যাচল রাম অনুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন?"

"মাথা তো উনি ঘামাচ্ছেন না। তোমাদের অনুকে কিডন্যাপ করাও ওঁর উদ্দেশ্য নয়। তেমন কোনও টার্গেটও ওঁর ছিল বলে মনে হয় না। লালজির নির্দেশেই যখন অনুকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এইসব ব্যাপারে সবকিছুই ওঁরও নখদর্পণে। বিন্ধ্যাচল রামই বলো আর লালজি ভিমানিই বলে ওঁরা একই দলের লোক। একই পেশা এবং একই ধান্দা ওদের। তা ছাড়া অনুকে যারা নিয়ে গেছে তারা আমার পরিচিত। ওরা ওকে নিয়ে গেলে বিন্ধ্যাচলের ওখানেই রাখবে।"

বাবলু একটু কী যেন ভেবে বলল, "বিন্ধ্যাচলকে নিয়ে অনেক অঙ্ক তো আমরা কষে ফেললাম। কিন্তু ধরো ওরা যদি ওকে সত্যি-সত্যিই না নিয়ে গিয়ে থাকে?"

ছবি : সুব্রত চৌধুরী (ক্রমশ)

খাবার ও সম্পদের খোঁজে সমুদ্রে হাত বাড়িয়েছে মানুষ

পুরীর সমুদ্র-উপকূলে মৎস্যজীবীরা

সমুদ্র বিশাল, বিপুল শক্তিভাণ্ডার। মানুষের চাহিদা মেটাতে সমুদ্র তোলপাড় করা হচ্ছে। জানিয়েছেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় দু'শতাংশ। জনসংখ্যা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে প্রকৃতির কাছে মানুষের চাহিদা। বেঁচে থাকার জন্য এই চাহিদা মূলত দুটি বিষয়ে— খাদ্য ও খনিজ সম্পদ। খাবার না খেলে মানুষ বাঁচে না। খনিজ সম্পদের অভাবেও সভ্যতার অগ্রগতির পথ বন্ধ। খনিজ সম্পদ বলতে লোহা, তামা, দস্তা, সোনা, রুপো যেমন আছে, তেমনই জ্বালানি হিসেবে কয়লা, প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাসের চাহিদাও বাড়ছে। নানারকম পাথর, মাটি ও বালির প্রয়োজনও বেড়ে চলেছে। এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ একবার খরচ করলে, আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। খাদ্যসামগ্রী পৃথিবীর মাটিতে বীজ পুঁতে বারবার তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু উর্বর জমিরও একটা সীমা রয়েছে। পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ জমি চাষের উপযুক্ত। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে হয়তো একদিন পৃথিবীর সব লোককে খেতে দেওয়ার মতো ফসল ফলানো যাবে না। তাই মানুষের চোখ পড়েছে স্থলভাগ ছেড়ে বিশাল জলরাশির দিকে।

সমুদ্রে আছে প্রচুর খাবার ও খনিজ সম্পদ। মানুষের প্রধান চাহিদাও এই দুটি। সমুদ্রে একদিকে রয়েছে যেমন নানা ধরনের প্রাণী, যা মানুষ খাবারের জন্য এখনই ব্যবহার করে। অন্যদিকে রয়েছে বিশাল খনিজ সম্পদ, যা খনন করে তোলা সম্ভব যদি প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হয়। সর্বোপরি, সমুদ্রের জলে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার এক প্রধান উপাদান—লবণ।

সমুদ্রে খাদ্যের সন্ধানে

সমুদ্র থেকে মানুষ যে খাদ্য সংগ্রহ করে তা প্রধানত মাছ। সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন এবং মাছ খাওয়া—এই দুটিই সভ্যতার বহু প্রাচীন ব্যাপার। সমুদ্রে পাওয়া যায় নানা ধরনের মাছ। ফলে স্থলের

খাবার শেষ হলেও সমুদ্রের খাবার রয়েছে প্রচুর। যদিও শতকরা ৭১ ভাগ অংশ সমুদ্র, তবুও মানুষ তার খাদ্যভাণ্ডারের মাত্র ১০ ভাগ সমুদ্র থেকে নেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসযোগ্য জমি যখনই কম পড়বে তখনই চাষের জমিতে বাড়ি তৈরি হবে। ফলে ফসলের হার কমতে থাকবে ক্রমাগত। আর তখনই বাড়বে সামুদ্রিক প্রাণীর চাহিদা।

সমুদ্রে মাছ ধরাটা যদিও প্রাচীন, তবে ডিঙি নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে আজও দেখা যায় ভারতের নানা উপকূলে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শুরু হয়েছে মোটরচালিত ট্রলার বা লঞ্চে করে মাঝসমুদ্র থেকে মাছধরা। এতে নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মাছধরার পরিমাণও। মাছধরাটা এখন একটা শিল্প—মৎস্যশিল্প। এর উৎপাদন যত বাড়ছে, বাড়ছে চাহিদাও। পৃথিবীতে মৎস্যশিল্পে জাপান এবং রাশিয়ার উৎপাদন-হার সবচেয়ে বেশি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমুদ্রে মাছের চাষও করা হচ্ছে। যেহেতু সামুদ্রিক মাছে খাদ্যের গুণাগুণ এবং পুষ্টি প্রভূত, তাই মাছচাষের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে মাছ ছাড়াও অ্যালগি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্যগুণ বিচার করে জানানো হচ্ছে, কোনও-কোনও খাবারের চেয়ে এদের খাদ্যগুণ অনেক বেশি। কিন্তু মানুষ এখনও এসব প্রাণী তাদের খাদ্যতালিকায় নেয়নি। তবে এদের উৎপাদনের হারের দিকে লক্ষ রেখে চেষ্টা চলছে এগুলিকে মানুষের খাদ্য তালিকায় ঢোকানোর।

খনিজ সম্পদের খোঁজে সমুদ্রমন্থন

পৃথিবীর মাটিতে যা খনিজ সম্পদ আছে, তার প্রায় সবই, অথচ অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে সমুদ্রে। তবে সমুদ্রের জলে যে নুন মিশে আছে তার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। লবণাক্ত জলকে সমুদ্রের পাড়ে বাঁধ দিয়ে রেখে সূর্যের তাপে শুকিয়ে ফেলা হয়। পড়ে থাকে সাদা নুন। এই নুনের খনিজ নাম হ্যালাইট। এ ছাড়া আপাতত সমুদ্র থেকে ম্যাগনেশিয়াম এবং ব্রোমিন খনিজ পদার্থ বের করা হয় এবং বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ পদার্থ থাকলেই হল না। দেখতে হবে, খনন কার্যের খরচ আর সেই পদার্থের বাজারদর। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক মূল্যায়ন করতে হবে। যদি লাভজনক হয় তবেই খনন করা হয়। সমুদ্রে খননকার্যের খরচ অনেক বেশি। তাই বাণিজ্যিকভাবে খনন এখনও শুরু হয়নি। সমুদ্র থেকে সংগৃহীত খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দামি। লবণ শিল্প সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে। আর চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ ব্রোমিন পাওয়া যায় সমুদ্র থেকেই। এ ছাড়া আরও অনেক পদার্থ মিশে রয়েছে সমুদ্রের মাটিতে, পাথরে, জলে। একসময় সোনা আহরণেরও চেষ্টা হয়েছিল। খরচে পোষায়নি বলে পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। সমুদ্রের তলায় ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফেট পিণ্ডের আবস্থান দেখা গেছে অনেক জায়গায়। এসব পিণ্ডে নানান পদার্থ থাকে। এদের সন্ধান পাওয়ার পর খনন করে আহরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির

সমুদ্রে মাছ ধরাটা আজও প্রাচীন

সাহায্যে। অতলান্তিক সাগরে প্রায় ১০০০ মিটার গভীরে বিশেষ পদ্ধতিতে খননকার্য চালিয়ে দিনে ১৬০০ টন এই পিণ্ড তুলতে পারা গেছে।

সমুদ্রের জল নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। লবণাক্ত জল পানীয় জলে পরিণত করতে পারলে পৃথিবী থেকে জলের অভাব দূর করা সম্ভব। নানা দেশে এ নিয়ে পরীক্ষা চলছে। সারা পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত ৭০ রকম পদ্ধতিতে লবণযুক্ত জল তৈরির প্রায় হাজারটি শিল্প রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারখানা আমেরিকার ফ্লোরিডার তীরে কি ওয়েস্ট (Key West) এলাকায়।

সমুদ্রের থেকে আর-একটি বড় পাওনা প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস। সারা পৃথিবী জুড়ে মহাদেশীয় উপতটে চলছে তেলের সন্ধান এবং খননকার্য। ভারতের পশ্চিমে গুজরাত-মহারাষ্ট্র এবং পূর্বে তামিলনাড়ু-অন্ধ্রের উপতটে তেল ও গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। পরীক্ষা চলছে সমগ্র উপতট এলাকায়। তেল-ভাণ্ডারের সঙ্গে রয়েছে গন্ধক, অনেক জায়গায়।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতেও শুরু হয়েছে সমুদ্র নিয়ে নানা গবেষণা, তিন দশক আগে। প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস ছাড়া আর কোনও খননকার্য এখনও পর্যন্ত হয়নি। তবে ওড়িশার ছত্রপুর এবং কেরলের চাওড়া এলাকার তীরবর্তী অঞ্চলে ভারী খনিজ পদার্থের খননকার্য চলছে। ইলমেনাইট, গার্নেট ইত্যাদি পাওয়াও যাচ্ছে।

সাগরদ্বীপ এখনও চলে সৌরশক্তিতে

সৌরকোষের সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপের গ্রামে গ্রামে জ্বলছে সৌরশক্তির আলো। পৃথিবী জুড়ে এই সৌরশক্তি নিয়ে চলছে গবেষণা। কেননা সৌরশক্তির উৎপাদনে কোনও দূষণ নেই। জানাচ্ছেন তপন বারিক

সাগরদ্বীপ বললেই মনে হয় যেন পদে পদে বিপদ আর অরণ্যে ঘেরা অন্ধকারে ঢেকে আছে। সে অনেক পুরনো কথা। নদ-নদীর বাধা টপকে কাকদ্বীপ থেকে বিদ্যুৎ কিছুতেই এই দ্বীপে আনা যায়নি। কিন্তু সৌরশক্তির কল্যাণে সাগরদ্বীপ হয়ে উঠেছে আলোকময়।

সাগরদ্বীপকে অনেকে আদর করে বলেন সৌরদ্বীপ। গঙ্গাসাগর মেলা ও সৌর প্রকল্পের পরিচয় নিয়ে সাগরদ্বীপের কম্পিউটার ইন্টারনেট, এখন ধীরে ধীরে বিশ্বের মানুষের কাছে তথ্যের দরজা খুলে দিয়েছে।

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন এবং ওয়েবরেডা-র (পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা) অধিকর্তা শান্তিপদ গণচৌধুরীর যৌথ উদ্যোগে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল সাগরদ্বীপের কমলপুর পরিদর্শন করেন। সে-বছরই মে মাসে বিদ্যুৎমন্ত্রী, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সমবায় দপ্তর এবং সাগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাগরদ্বীপে গড়ে ওঠে 'সাগরদ্বীপ গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন সমবায় সমিতি'।

এই সমবায় সমিতিই সাগরদ্বীপের সৌরযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। ওয়েবরেডা ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের অভিনব সৌরশক্তির প্রকল্পটি এই দ্বীপের কমলপুরে গড়ে তোলে। রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি ওই সৌর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটি সাগরদ্বীপের সর্বপ্রথম বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যা গ্রিড লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে। এ ঘটনা পূর্ব ভারতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সাগরদ্বীপের সৌর সমিতি, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে সারা ভারতবর্ষে

প্ল্যান্ট কন্ট্রোলার মেশিন

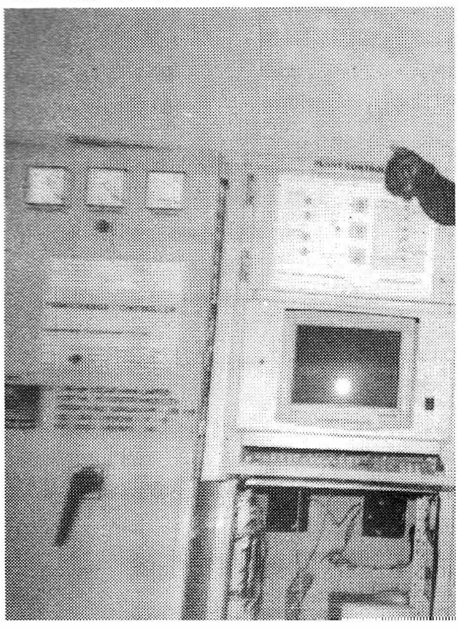

এই প্রথম অভিনব ঘটনার সাক্ষী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এর আগে এই ধরনের প্রকল্প ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চলে দেখা যায়নি।

এখানে শক্তি উন্নয়ন সমিতি সাগরদ্বীপে আটটি সৌর প্রকল্প গড়ে তুলছে। এগুলির মধ্যে ছ'টির কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকি দুটির কাজ এখনও শুরু হয়নি।

কমলপুর সৌরপ্রকল্পের বর্তমান গ্রাহক ৬৩ জন। মৃত্যুঞ্জয়নগরের ১১০, খাসমহলের ১১৪, শিবপুরের ১১২, মহেন্দ্রগঞ্জের ১১৯ এবং নটেন্দ্রপুরের ৮৪ জন। উত্তর হারাধনপুর ও মন্দিরতলা গ্রাম দুটি সৌর প্রকল্পের আওতায় আসেনি।

সাগরদ্বীপের সৌর সমবায় সমিতির কালেক্টর অজিত দাস জানালেন, প্রতিটি প্রকল্পে ২৫ থেকে ২৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রকল্পে ৩২০ থেকে ৩৫০টি সোলার প্লেট বা মডিউল আছে।

দু'ধরনের পদ্ধতিতে গ্রাহকরা এই প্রকল্প থেকে বাড়ির জন্য বিদ্যুৎ নিতে পারেন। যেসব গ্রাহক সমিতিকে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে বিদ্যুৎ নেন, তাঁরা ১২০ ওয়াট বিদ্যুৎ পান। এবং তাঁরা একসঙ্গে পাঁচটি সোলার টিউব লাইট অথবা তিনটি টিউব, একটি পাখা ও একটি টিভি চালাতে পারেন। অন্যদিকে পাঁচশো টাকার গ্রাহকরা ৬০ ওয়াট বিদ্যুৎ পেতে পারেন এবং বিনিময়ে একসঙ্গে তিনটি সোলার টিউব বা একটি টিভি, একটি পাখা ও একটি সোলার টিউব জ্বালাতে পারেন।

এই আটটি সৌরপ্রকল্প ও আরও আটটি ছোট সৌরশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র সাগরদ্বীপে মোট ২৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, যাতে সরাসরি প্রায় ১১০০ জন গ্রাহক উপকৃত হবেন বলে সমিতির আশা।

সৌরশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাংশ টাটা, অগ্নি, গীতাঞ্জলি, ওয়েবল কোম্পানির। ওঁরা ওয়েবরেডোরের মাধ্যমে এই যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা ভেবে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় নতুন ৬০ শয্যার, সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে সৌরপ্রকল্প গড়ে উঠেছে। দ্বীপের তিনটি স্কুলের ছাত্রাবাসেও সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

সোলার এজেন্ট, বিকাশ জানার মতে, সাগরদ্বীপে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০-৮০০টি পরিবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌরবিদ্যুৎ নিয়েছেন। এঁরা প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ নেননি, এজেন্টদের কাছ থেকেই নিয়েছেন।

হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ, ভ্যাকসিন প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য সোলার ফ্রিজ, রান্নার জন্য সোলার কুকার, জল তোলার জন্য সোলার পাম্প, শুকনোর জন্য সোলার ড্রায়ার, গম ভাঙা কল, সোলার টর্চ, সোলার লণ্ঠন ভবিষ্যতে সাগরদ্বীপের মানুষের ব্যবহারে লাগবে বলে আশা করা যায়।

এখন সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে, জেনারেটরের মাধ্যমে হাট-বাজারের দোকানে ও অল্পকিছু পরিবার মিলে প্রায় ৫৫০ জন গ্রাহককে দিনে চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেন। তাই রুদ্রনগরে ৩০০ কিলোওয়াটের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ফলে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের জ্বালানি খরচ কমিয়ে গ্রাহককে চার ঘণ্টার অনেক বেশি বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হবে।

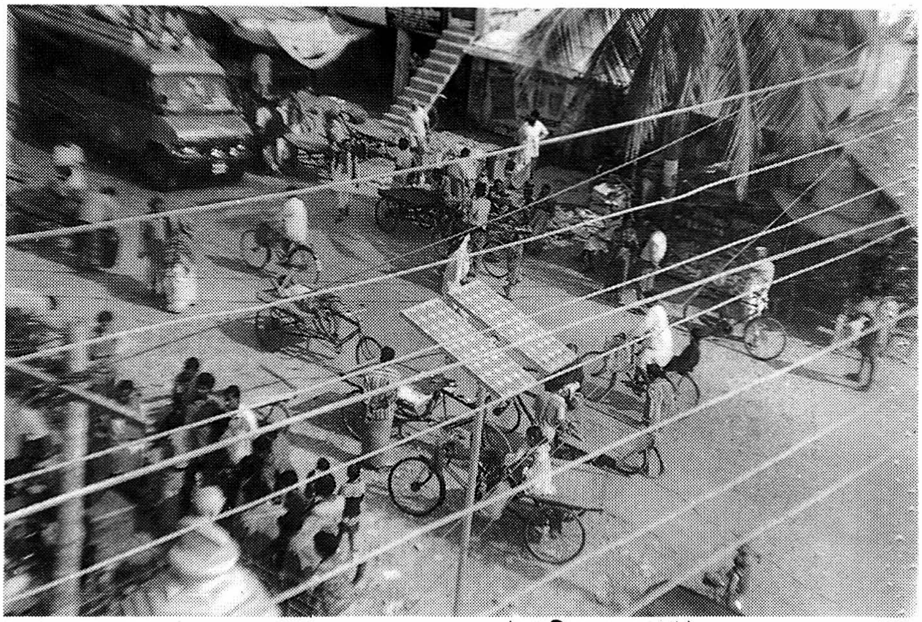

সৌরশক্তির কল্যাণে প্রাণচঞ্চল সাগরদ্বীপ

কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্টারি অব নন-কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স (এম.এন.ই.এস.) এবং রাজ্য সরকারের ওয়েবরেডা যুগ্মভাবে সাগরদ্বীপে সৌরপ্রকল্প গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগ নেয়। যাঁরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌরবিদ্যুৎ বাড়িতে নিয়েছেন, তাঁদের এম.এন.ই.এস—ওয়েবরেডা ৬,০০০ টাকা ছাড় দেয়। ফলে গ্রাহককে মাত্র ৮,০০০ টাকা দিতে হয় একটি সোলার প্লেটের জন্য।

হোম লাইটিং শেডের ক্ষেত্রে কোনও সোলার প্লেট ৩৭ ওয়াটের হলেই তার ব্যাটারি হবে চল্লিশ অ্যাম্পায়ার আওয়ারের। এক্ষেত্রে দুটি লাইট ফিটিং এবং একটি চার্জ কন্ট্রোলার থাকবে। যার দাম ১৪,০০০ টাকা।

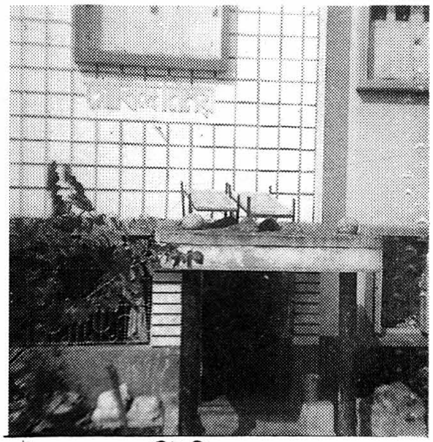

এইরকম অনেক বাড়িই বিদ্যুৎ পাচ্ছে সোলার প্রকল্পের সাহায্যে

সম্প্রতি এম.এন.ই.এসের মতো ওয়েবরেডাও সুন্দরবনের বিদ্যুৎহীন মৌজা গ্রাহকদের ৬,০০০ টাকা ছাড় দিয়ে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ভেবেছে। এক্ষেত্রে গ্রাহককে মাত্র ২,০০০ টাকা দিতে হবে।

স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের মতোই একটি সংস্থা হল রুর‍্যাল এনার্জি ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (আর.ই.ডি.সি)। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এই সংস্থা খতিয়ে দেখেছে যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ গ্রামে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তাই আর.ই.ডি.সি রুর‍্যাল নন-ইলেকট্রিফায়েড এলাকাতে ৬,০০০ টাকা ছাড়ে প্রতি মৌজায় সোলার হোম লাইটিং শেড পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রী কৃষ্ণকুমার কমলপুরের সৌর ইউনিট পরিদর্শন করে বিজ্ঞান কর্মীদের সাগরদ্বীপকে 'সৌরদ্বীপ' হিসেবে ঘোষণার দাবিটি দ্রুত বিবেচনার আশ্বাস দেন। এটি সাগরদ্বীপের অধিবাসীদের কাছে আশার কথা।

ফোটো : লেখক

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন হাইপারপ্লেন-এর প্রযুক্তি

নতুন ধরনের এই মহাকাশফেরি প্রযুক্তিগত দিক থেকে একেবারেই অন্য ধরনের। যে কোনও বিমানবন্দর থেকে ওঠানামা করতে পারবে এই মহাকাশফেরি। জানিয়েছেন প্রদীপচন্দ্র বসু

ভবিষ্যতে মহাকাশে বারবার যাতায়াত সহজ করার জন্য স্পেস শাট্‌লের চেয়েও আরও উন্নত মহাকাশযান নির্মাণের চেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কয়েকবছর আগে। এর নাম রাখা হয়েছে 'হাইপারপ্লেন'। এটি অবশ্য সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে পুরো নাম—'হাইপারসোনিক প্ল্যাটফর্ম ফর এয়ার-ব্রিদিং এজেন্ট টু নিয়ার আর্থ অরবিট'।

পরিকল্পনা সফল হলে অত্যাধুনিক এই মহাকাশযান পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণের পর সরাসরি মহাকাশে গিয়ে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে। জেট বিমান ও আধুনিক রকেটের প্রযুক্তিগত মিলন ঘটিয়ে তৈরি হবে এই যানটি। সেই 'স্পুটনিক' থেকে শুরু করে আধুনিক স্পেস শাট্‌ল, সব ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানকে কক্ষপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার আলাদা রকেট ও বুস্টার রকেট। হাইপারপ্লেনে এই আলাদা রকেট লাগবে না। স্পেস শাট্‌লের মতোই মহাকাশফেরির কাজ করবে এই প্লেন। পৃথিবীর যে কোনও বিমানবন্দর থেকে উড়তে পারবে। সহজে নেমেও আসবে জেট বিমানের মতো।

পৃথিবী থেকে আকাশে ওড়ার পর হাইপারপ্লেনের 'ক্রায়োজেনিক ফ্যান স্ক্র্যামজেট' এঞ্জিন এই প্লেনকে শব্দের আটগুণ বেশি গতিতে মহাকাশে নিয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, হাইপারপ্লেনের প্রতিটি উড়ানের জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্বালানি পৃথিবী থেকে ভরে দিতে হবে না। মহাকাশে যাওয়ার সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশযানের আবহমণ্ডল থেকে এই প্লেনে লাগানো এক বিশেষ যন্ত্র জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন তৈরি করে নেবে। ফলে মাটি থেকে আকাশে ওঠার সময় এই যানের ওজন হবে কম। অন্যদিকে গতি হবে বেশি। জিনিসপত্র এবং মানুষও বইতে পারবে অনেক। এখন মহাকাশযানের রকেটগুলি হয় বহুস্তর। কিন্তু হাইপারপ্লেনের এঞ্জিন হবে একস্তর। এই প্লেনের শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে কার্বন, বেরিলিয়াম, টাইটেনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের অত্যাধুনিক সঙ্কর ধাতু।

শুনলে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন, এই হাইপারপ্লেন তৈরির সম্ভাবনার কথা প্রথমে ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানীদের মাথায় এসেছে। ভারতীয় সামরিক দফতরের তিন বিজ্ঞানী এস গোল্লাকোটা, পি বেনুগোপালন ও এ শিবাতনু পিল্লাই এবং ভারত ডাইনামিকস লিমিটেডের বিজ্ঞানী এয়ার কমোডর আর গোপালস্বামী—এই চারজন মিলে হাইপারপ্লেনের প্রাথমিক নকশা তৈরি করেছেন। নকশা অনুযায়ী প্রথম প্লেনটি তৈরি করতে কয়েক হাজার কোটি টাকা দরকার। অন্য কোনও দেশ থেকে এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে যৌথ উদ্যোগ না গড়লে, একা ভারতের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক এই মহাকাশযান নির্মাণ বোধহয় সম্ভব হবে না!

ভারত যখন হাইপারপ্লেন তৈরির পরিকল্পনা

এইরকম স্পেস-শাটল-এর চেয়েও উন্নত মহাকাশযান তৈরি

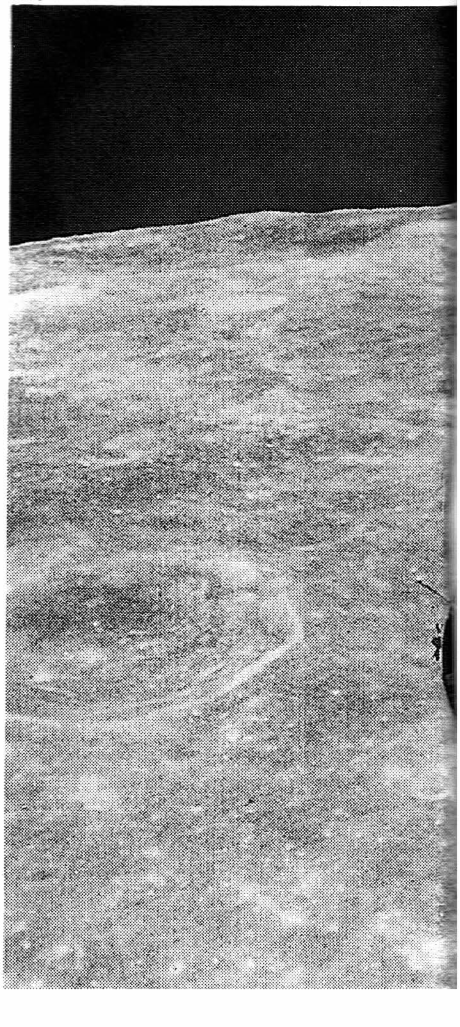

করছিল, আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞান সংস্থা নাসা-র বিজ্ঞানীরা তখন চেষ্টা চালাচ্ছিলেন কম খরচে দ্বিতীয় প্রজন্মের স্পেস শাট্‌ল নির্মাণের। নতুন প্রজন্মের স্পেস শাট্‌লকে বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে চান 'স্পেস ট্রান্সফার ভেহিক্‌ল' হিসেবে। এ ধরনের স্পেস ভেহিক্‌ল বা মহাকাশযান তৈরি হলে, পৃথিবী থেকে উর্ধ্বাকাশের নিচু কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া যে কোনও ভারী জিনিসকে সহজেই আরও অনেক উঁচুতে ভূসমলয় কক্ষপথে, এমনকী তার চেয়েও উঁচুতে বহন করে নেওয়া সম্ভব হবে।

আমেরিকা প্রথম প্রজন্মের স্পেস শাট্‌ল আকাশে ওড়াবার পর আরও কয়েকটি দেশ স্পেস শাট্‌ল তৈরির কাজে হাত দেয়। এদের মধ্যে জাপান গত শতকের শেষ দশকের গোড়ায় প্রথম স্পেস শাট্‌ল মহাকাশে পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছিল। পরিকল্পনা ছিল, প্রথম শাট্‌লে কোনও যাত্রী থাকবে না। যাত্রিবাহী জাপানি শাট্‌ল মহাকাশে যাবে ২১ শতকের গোড়ায়। ১৯৮৮-র সেপ্টেম্বর মাসে জাপান পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম স্পেস শাট্‌লকে মহাকাশে পাঠায়।

জাপানের স্পেস শাট্‌ল মহাকাশে যাওয়ার এক মাস পর যাত্রিবাহী রুশ স্পেস শাট্‌ল 'বুরান'-এর মহাকাশে যাওয়ার কথা ছিল। এতে চড়ে মহাকাশে যাওয়ার কথা ছিল অভিজ্ঞ মহাকাশচারী ইগর ভোক-এর। কিন্তু কাজাখস্তানের বৈকানুর মহাকাশকেন্দ্র থেকে ওড়ার ৫১ সেকেন্ড আগে কম্পিউটারের এক আকস্মিক নির্দেশে রকেটে অগ্নিসংযোগ স্থগিত রাখা হয়। ১৯৮১-র এপ্রিলে আমেরিকার প্রথম স্পেস শাট্‌ল 'কলম্বিয়া'-র উৎক্ষেপণও এভাবে স্থগিত রাখা হচ্ছিল।

'বুরান'-এর মহাকাশযাত্রা বন্ধ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, যাত্রা শুরুর ঠিক আগে এর বুস্টার রকেট 'এনার্জিয়া'-র জ্বালানি ভাণ্ডার থেকে তরল অক্সিজেন বেরোতে শুরু করেছিল। এ ছাড়া, উৎক্ষেপণমঞ্চটিও ঠিকমতো কাজ করছিল না। প্রথম উৎক্ষেপণ স্থগিত হলেও 'বুরান' সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে যায় ১৯৮৮-র ১৫ নভেম্বর। এই উড়ানে কোনও অভিযাত্রী ছিলেন না। রুশ ভাষায় 'বুরান' শব্দের অর্থ 'তুষারঝড়'। প্রথমবার মহাকাশে গিয়ে এই রুশ মহাকাশফেরি ২০০ মিনিটে পৃথিবীকে দু'বার পাক খেয়ে নিরাপদে বৈকানুর উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে নেমে আসে। যদিও এই 'বুরান'-কে নিয়ে রাশিয়ার মহাকাশবিজ্ঞানীদের অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

গ্রহাণু ইরোস-এ মহাকাশযান

পৃথিবী থেকে ৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে অবস্থান গ্রহাণু 'ইরোস'-এর। গ্রিক প্রেমের দেবতার নামে নামাঙ্কিত পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহাণুতে অবতরণ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য নাসা এক বছর আগে 'নিয়ার আর্থ অ্যাস্টরয়েড রঁদেভু', সংক্ষেপে 'নিয়ার', প্রোগ্রাম অনুযায়ী পাঠিয়েছিল সৌরশক্তিচালিত 'নিয়ার শুমেখার' মহাকাশযানকে। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০১-এ মহাকাশযানটি পৌঁছে যায় 'ইরোস'-এ। এর আগে পৃথিবীর মহাকাশযান এত দূরে যায়নি কোনও গ্রহ, উপগ্রহ বা গ্রহাণুতে অবতরণের জন্য।

'ইরোস' অভিযানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলেছেন, আমাদের সৌরজগতের গ্রহাণুগুলি পৃথিবীর মতো একই ধরনের অনেক উপাদান দিয়ে তৈরি। হয়তো আনুপাতিক হার সমান নয়! আবহমণ্ডলের পরিবর্তন ও ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতাও গ্রহাণুর কম। আবার এই দুটি কারণের জন্যেই গ্রহাণু সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আমাদের এই সৌরজগৎ শৈশবে কী অবস্থায় ছিল।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ দূর মহাকাশের কোনও গ্রহাণুকে খুব কাছ থেকে দেখেনি। এ কারণে, নাসার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা 'নিয়ার শুমেখার' যানের একপাশে বাইরের দিকে এমনভাবে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে যানটি 'ইরোস'-এ অবতরণের সময় পৃথিবীতে সরাসরি 'লাইভ পিকচার' পাঠাতে পারে। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর মহাকাশযান যখন 'ইরোস'-এ গেছে, গ্রহাণুটি তখন মঙ্গলের কক্ষপথের বাইরে অবস্থান করছিল।

চেষ্টা চলছে

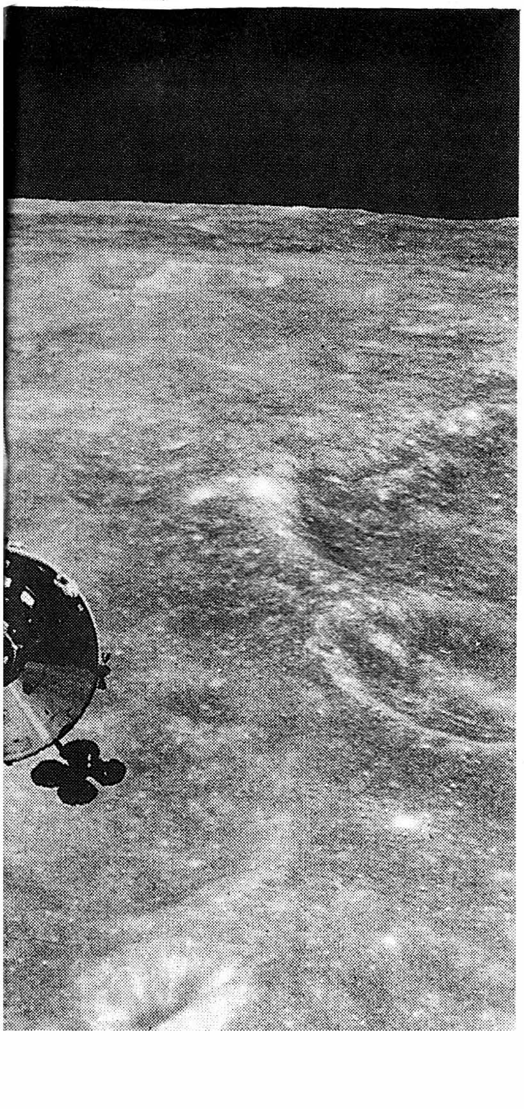

বাঙালির তিন প্রজন্ম জুড়ে বেঁচে আছে গল্পের দাদা

শিরোনামটা দেখে অনেকেই রাগ করতে পারেন। কেন, শুধু ছোটদের দাদা কেন? বড়দের নয় বুঝি?

আসলে এখানে 'ছোট' বলতে শুধু ছোটদের কথা বলছি না। অনেক বড়রাও তাঁদের বয়স্ক কেজো মনের মধ্যে অতি সন্তর্পণে একটা তাজা সবুজ ছেলেবেলা লুকিয়ে রাখেন। সেই মন ভাল করা ছেলেমানুষির জগতে বয়স মাপার সব চোখরাঙানি হিসেব নিকেশ বেমালুম 'ভ্যানিশ'। সেখানে দাদুর কাছ থেকে নাতনি, ছেলের কাছ থেকে মা কাড়াকাড়ি করে আমসত্ত্ব খান, ক্যালিডোস্কোপ দেখেন, আর ঘনাদা-টেনিদা-ফেলুদার কাণ্ড কারখানা পড়েন। এখানে সেই ছোটদের জগৎটার কথাই বলছি, যেখানে এখনও সব সাদা আর সোজা, সকলেই আমুদে আর কৌতূহলী।

বাঙালির তিন প্রজন্ম জুড়ে এরা একান্ত প্রিয় দাদা। সকলেরই দাদা। দাদুরও দাদা। নাতনিরও দাদা।

এমনই তো হওয়ার কথা সেই সব চরিত্রদের। যাঁরা চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ। থুত্থুড়ে শার্লক হোমসের কথা কে কবে শুনেছে? কে ভেবেছে টিনটিনের চুলে কোনওদিন পাক ধরবে? প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে এরা এক। পাঠকদের ভালবাসায় বেঁচে আছে বছরের পর বছর।

বাংলা সাহিত্যের দাদারাও তেমনই। বাঙালি পাঠক বারবার তাদের কাছে ফিরে আসেন।

এই জনপ্রিয়তার কথা বাদ দিলে অবশ্য দাদাদের মধ্যে আর বিশেষ মিল নেই কোনও। না কাজকর্মে, না মেজাজে-মরজিতে।

ঘনশ্যাম দাস

আমাদের কাছে 'ঘনাদা' নামে পরিচিত হলে হবে কী, বিদেশের বড় বড় মানুষদের কাছে তার পরিচয় তার পদবিতেই। আলাপ করতে গেলে নিজেও বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় দেয় সেভাবেই, 'অধীনের নাম দাস।'

এই নামেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে তার কাছে সাহায্যের আবেদন আসে। অতলান্তিক মহাসাগরের তলদেশের গোপন মানচিত্র চুরির কুমতলবকে বানচাল করতে হবে, ব্রিটিশ সরকার গোপনে তাকে তলব করল, লুপ্তপ্রায় সাগর ভোঁদড়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে—তাইওয়ান সরকার তার পৃষ্ঠপোষকতা চাইল ; জাহাজে আণবিক ঘড়ি পাচার হচ্ছে, জাপান সরকার কিছু করার অনুরোধ জানাল অগতির গতি এই হের ডসকেই।

অথচ মানুষটি থাকে অতি সাধারণ পরিবেশে। ৭২, বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে। এমন গলির কথা যে কলকাতার কোনও পথনির্দেশিকায় পাওয়া যাবে না

দাদুরও দাদা, নাতনিরও দাদা। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন কীর্তিমান দাদাকে আজও ভুলতে পারেননি বাঙালি পাঠক। লিখেছেন দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট এক অসাধারণ চরিত্র ঘনাদা
ছবি : অজিত গুপ্ত

সে আর আশ্চর্য কী। ঘনাদা যে এত সব জায়গায় অভিযান করেছে তার সব কি আর মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে? অ্যালবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের কাছে ক্যারোলাইনের অ্যাটল কেমন, দেখি ম্যাপে খুঁজে বার করো। কিংবা টোজা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে লিমু আর নিকা।

এত বড় মানুষটি থাকে কেমন অকিঞ্চিৎকরভাবে। আর পাঁচটা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির মতোই। গলির ধারে উপচে পড়া ডাস্টবিন আর ঘুঁটে লেপটানো পোড়ো দেওয়াল। খাপরা আর টিনের চালের বসতির মাঝে বেঢপ, বেমানান, পলস্তারা-খসা সেকেলে মেসবাড়ি। তার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠলে ঘনাদার এক চিলতে ঘর। একপাশে ভাঙাচোরা তক্তপোশ। তার ওপর ছোট কম্বলজড়ানো বিছানা। নীচে পুরনো রংচটা ঢাউস তোরঙ্গ। আর একদিকে একটা কেরোসিন কাঠের শেল্‌ফ। এমন ঘরে না থাকলে ঘনাদাকে কি আপামর বাঙালি সাহস করে আপন করতে পারত?

এই ৭২ নম্বরের তিন তলায় ঘনাদার সাম্রাজ্য।তার ভাষায় এখান ছেড়ে 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।' এখানে অথবা দোতলার কমনরুমে আরাম কেদারায় শায়িত হয়ে গড়গড়া টানতে টানতে তার বলা কাহিনীতে সকলের বিশ্বদর্শন। সকলে মানে, প্রত্যক্ষভাবে মেসের অন্য কমবয়সী আবাসিক সুবীর, গৌর, শিবু, শিশিরের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিন প্রজন্মের বাঙালি পাঠকের। কোথায় না গেছে ঘনাদা। আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার রহস্যময় জঙ্গল তো তাকে বারবার টেনেছে। সেই সঙ্গে প্যাসিফিক, অতলান্তিকের খুচরো দ্বীপ। তা ছাড়া চষে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপও। প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনের মতো চেনাজানা শহর থেকে সুদানের খার্তুম, পেরুর লিমা, কিউবার সান্তিয়াগো কোথায় না গেছেন। এমনকী হঠাৎ সুযোগ পেয়ে সামান্য সময়ের জন্য মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত।

আর সব জায়গাতেই চমকে দেওয়ার মতো অফুরন্ত তার অভিজ্ঞতা। নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কেও তাঁর গল্প মজুত। তার ঊর্ধ্বতন বাইশতম পূর্বপুরুষ ঘনরাম ওরফে 'গানাদো' ১৫২০ সালে ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করে মেক্সিকো বিজেতা হের্নান্দো কর্টেজ ও তার দলবলকে বাঁচিয়ে দেয়। ঘনাদার ঊর্ধ্বতন ষোলোতম পূর্বপুরুষ বচনরাম ওরফে মির-ই-ইমারৎ ও তার স্ত্রী ফিরোজার সহায়তায় শিবাজি আগ্রা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ঘনাদার মতো বেপরোয়া কল্পনাবিলাসী বাংলা সাহিত্যে আর দুটি নেই। পাঠকের বিশ্বাস করার ক্ষমতাকে সে শক্ত শক্ত পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

তার বলার ভঙ্গি, ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তার ঈর্ষণীয় দখল, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য পাঠকদের এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে তাঁর প্রতিটি কথাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে ইচ্ছে করে। তাঁর কাছেই বাঙালি পাঠক শুনেছে লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস নামে সুমাত্রার খোলসহীন শামুক, বছরে একবার ঠিক পয়লা কি দোসরা অগস্ট ডিম পাড়বেই; পুয়ের্তোরিকোর নক্টিলিউকা মিলিয়ারিসের জীবাণু নদীর জলকে আগুনের মতো উজ্জ্বল করে তোলে; লোগোগ্রাফি নামে এক গোপন ভাষায় এক থেকে দু'হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সব কথাই বলা যায়।

পাঠক ঘনাদার গল্পে আবিষ্কার করেন সত্যি আর স্বপ্ন মেশানো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য জগৎ। ছেলেবেলার নায়কের প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ বোধ করেন তিনি। এখানেই ঘনাদার সার্থকতা। ছোট-বড় সকলকে আকর্ষণ করতে পাবার জন্যই নিজের নামে ফ্যান ক্লাব প্রতিষ্ঠার এক দুর্লভ সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে তার। সে ক্লাবের ঠিকানা ছিল কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। যেখানে তার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি।

পটলডাঙার চারমূর্তিদের নিয়ে লিখেছেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি : শৈল চক্রবর্তী

ভজহরি মুখোপাধ্যায়

এক কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রশ্নটা করেছিলাম, ভজহরি মুখার্জি, কমলেশ ব্যানার্জি, স্বর্ণেন্দু সেন আর কুশল মিত্র কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টি চরিত্র? সবার মুখ চুন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৈরি বিখ্যাত চারমূর্তি টেনিদা-প্যালা-হাবুল আর ক্যাবলার ভাল নাম যে যথাক্রমে ওগুলো, সে আর ক'জন খেয়াল রাখে!

টেনিদারই সব সময় খেয়াল থাকে না। সেবার ওরা কুট্টি মামার কাছে ডুয়ার্সে যাচ্ছে। প্লেনে ওঠবার আগে যাত্রীদের নাম ডাকা হচ্ছে। হাবুল তো অভ্যেসে 'প্রেজেন্ট সার' বলে ফেলল। আসলে এই সব নামের অস্তিত্ব আগে শুধু ছিল স্কুলের খাতায় এবং পরে যখন ওরা একসঙ্গে কলেজে ভর্তি হল তখন উঠল সেখানের খাতায়।

টেনিদাকে যারা চেনে না, তারা বিশ্বাসই করবে না

ব্রজদার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন গৌরকিশোর ঘোষ
ছবি : অহিভূষণ মালিক

যে, ক্যাবলার মতো ছেলেমানুষ ছেলেটার সঙ্গে ও এক ক্লাসে পড়ে। লেখাপড়ার ব্যাপারে টেনিদার অভিজ্ঞতা তো বিশাল। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে অনেকবার, তার আগে এনট্রান্সও দিয়েছে বারকয়েক, পরে আবার স্কুল ফাইনাল শুরু হতে তা-ও চারবার দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাকি তিন মূর্তির সঙ্গে যখন ও এক সঙ্গে পাশ করল, তখন ওর দুঁদে বড়দা থেকে খুঁতখুঁতে পণ্ডিতমশাই অবধি সবাই অবাক। কে বিশ্বাস করবে যে এই টেনিই একবার ক্লাসে ধাতুরূপ বলেছিল গৌ-গৌবৌ-গৌবর?

কিন্তু পড়াশোনার মতো বিচ্ছিরি ব্যাপার বাদ দিলে, ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলই হোক আর পটলডাঙায় চাটুজ্জেদের রকই হোক, টেনিদাই সব সময় অবিসংবাদিত নেতা। সব সময় তার মুখে বড় বড় কীর্তি-কাহিনী। কখনও নিজের। আবার কখনও নিজেরই কোনও আত্মীয়ের, বিশেষত তার কুট্টিমামার।

কুট্টিমামা যে-সে লোক নয়। তিনি বুনো ভালুকের নাকে জ্বলন্ত টিকে ছুড়ে মারেন, কালী সিঙ্গির মহাভারতের এক ঘায়ে বাঘকে অজ্ঞান করে ফেলেন, আস্ত একটা পাঁঠার মাংস খেতে পারেন, তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেন তিন মিনিটে।

টেনিদার নিজের কীর্তিকাহিনী আরও চমকপ্রদ। কখনও সে বর্মা ফ্রন্টে গিয়ে জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কখনও একাই এক ম্যাচে বত্রিশটা গোল দেওয়ার বিশ্বরেকর্ড করছে, আবার কখনও বা অ্যায়সা কীর্তন ধরছে যে, চাটুজ্জেদের পোষা কোকিলটা হার্ট ফেল করছে।

মাঝে-মাঝে খানিকটা করে আলুকাবলি বা চপ বা ডালমুট মুখের কাছে ধরলেই এমন সব গল্প বেরিয়ে আসবে। তবে অবশ্য মন দিয়ে শুনতে হবে। অবিশ্বাসীর মতো হাসাহাসি করলে বা 'কুরুবকের মতো বকবক' করলেই 'পুদিচ্চেরি' কাণ্ড হবে একখানা। টেনিদা রেগে গিয়ে এমন একখানি 'জাত্যাপহ চড়' হাঁকাবে যে 'কান একেবারে কানপুরে' চলে যাবে। তখন আবার শালপাতায় করে কুলপি এনে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে হবে।

সত্যি, খেতে পারে বটে টেনিদা। জ্যান্ত ডেঁয়ো পিঁপড়েসুদ্ধ রসগোল্লার রস, ভীমরুলসুদ্ধ জামরুল। ক্যাবলা বলে যে টেনিদা ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-সুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে।

তবে কি ছোটদের এই নায়ক শুধু গুল-তাপ্পি মারে আর অন্যের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবার সাঁটায়? কক্ষনো নয়। টেনিদার যেমন চওড়া বুক, তেমনই চওড়া মন।

এসব প্রশংসার কথায় অবশ্য টেনিদা লজ্জা পায়। যেমন ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেন গোরুর দুঃখে আকুল হয়ে বলেছিল, 'গোবর হইল গিয়া গরুর নিজের জিনিষ, অন্য লোকে তাই নিয়া ঘুঁইট্যা দেয়। গরু এককানা ঘুঁইট্যা দিতে পারে না।' বলতে বলতে হাবুলের প্রায় চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম।

কিন্তু টেনিদার জ্বালায় চোখে জল রাখার উপায় আছে? এক্ষুনি হয়তো সে পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, 'ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস'। টেনিদার পাঠকমাত্রই জানেন, এর উত্তরে আন্তরিক উল্লাসে সমস্বরে বলতে হয়, 'ইয়াক ইয়াক!'

ব্রজরাজ কারফর্মা

আমাদের এই তৃতীয় দাদাটিও গুলবাজ। কাগজ অফিসে তার রিপোর্টারের চাকরি। সেখানে বসে বসেই বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মীদের সে 'গুল্প' শোনায়। শব্দটি তারই বানানো। 'গুল্প' মানে নাকি 'নির্ভেজাল সত্যি ঘটনা'। তবে ব্রজদার গুল আবার একটু অন্যরকম। টেনিদার মতো ছেলেমানুষি তো তার থাকবেই না। আবার ঘনাদার মতো এমন জ্ঞান-গাম্ভীর্যও নেই যে পাঠক কোনও সত্য-গুলের দোলাচলে ভুগবেন।

তাই ব্রজদা যখন বলে, কলকাতার বসন্ত কেবিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্যেন বোসের আলাপ করিয়ে দিয়েছে, বা রামমোহনকে বিলেত যাওয়ার টিকিট কিনে দিয়েছে, বা কেরি সাহেবকে বাংলা টাইপের নকশা এঁকে দিয়েছে তখন তার কল্পনার দৌড় দেখে নির্মল মজা পাই।

ব্রজদার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার প্রবল জাত্যাভিমান। তার নিজের কথায়, 'সাহেব হয়ে বাঙালিকে টেক্কা দেবে! তা কখনও হতে দেব না। ব্রিটিশ তো ছার, শক হুন দল পাঠান মোগল, কে এঁটে উঠতে পেরেছে বাঙালির সঙ্গে, দেখা দিকিনি হিস্ট্রিতে। আমাদের আমলে আমরা ছিলাম সেই তেজি হিস্ট্রির বাচ্চা।' সেই তেজেই দিশি বিমা কোম্পানি চালিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে ফেল করিয়ে দিয়েছে, ফোর্ট উইলিয়মে এডিকং কর্নেল সাহেবকে কুস্তিতে কাত করেছে, ইডেন গার্ডেনে জার্ডিনের এম. সি. সি ক্রিকেট দলকে রাম পেটান পিটিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বানিয়েছে। সাধে কি আর ব্রজদা নিজের ঢাক নিজে পেটান, 'আমার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি ও চিন্তাধারার খবর বাঙালি যদি না রাখে তবে ক্ষতি আমার নয়, বাঙালিরই। কারণ ব্রজরাজের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস!'

ব্রজদার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন সদ্যপ্রয়াত কথাসাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ ওরফে রূপদর্শী। তাঁর লেখা সম্পর্কে ব্রজদার মন্তব্য দিয়েই শেষ করি, 'ফ্যাক্টটুকু যা বলেছি তার সিকিটুকুও ও ফোটাতে পারেনি। এর উপর যদি একটু গুল চড়াতুম তবে সে তো ওর কলমের রেনজেই পৌঁছত না।'

প্রদোষচন্দ্র মিত্র

উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র আর সুকুমারের পুত্র হয়ে সত্যজিৎ রায় শুধুই ছবি আঁকবেন আর ছবি করবেন, তা কি কখনও সম্ভব? রক্তের টানেই তাঁকে নব-পর্যায়ের 'সন্দেশ'-এর সূত্রে ছোটদের জন্য কলম ধরতে হয়েছিল। তাতেই গোয়েন্দা ফেলুদার জন্ম। ছোটদের কাগজ থেকে অচিরেই তার স্থান হয়েছিল 'দেশ' সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। এবং বাংলা বইবাজারের বেস্টসেলার তালিকায়।

বোঝাই যায়, শুধু ছোটদের মধ্যে কখনও তার জনপ্রিয়তা সীমায়িত নয়। ফেলুদাই একবার বলেছিল, 'আসলে যেটা ঘটে সেটা হল কিশোরদের সঙ্গে তাদের মা, বাবা, মাসি, পিসি, খুড়ো, জ্যাঠা সকলেই এসব

উপন্যাস পড়ে। প্রকাশকের তাগাদা থেকেই বুঝতে পারি একসঙ্গে এত স্তরে আমার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে গেছে।' বাস্তবিক, বোম্বে সিনেমার ক্যামেরাম্যান থেকে কোন গণ্ডগ্রাম ঘুরঘুটিয়ার মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ, পুরীর পুলিশ থেকে হাজারিবাগের গৃহবধূ সব ধরনের মানুষের কাছেই ফেলুদা হিরো—পাঠকমাত্রই সে পরিচয় বারবার পেয়েছেন।

অথচ ফেলুদার জীবনটা শুরু হয়েছিল নেহাত সাদামাটাভাবে। মাত্র ন' বছর বয়সে তার বাবা অকালে মারা যায়। ছোটকাকার কাছেই সে মানুষ। ছোটকাকা মানে, ফেলুদার কাহিনী বর্ণনা করা হয় যে তপেশরঞ্জন ওরফে তোপসের বয়ানে, তারই বাবা। ছেলেবেলা থেকেই ফেলুদা দেশি-বিদেশি নানা ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। ওইসব পড়ে পড়েই তার মধ্যে এক আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা জন্মায়। আর জন্মায় গোয়েন্দাগিরির ইচ্ছে। সুযোগ এল পরপর দুবার কাকা আর তোপসের সঙ্গে দার্জিলিং আর লখ্নৌ বেড়াতে গিয়ে। এর মধ্যে লখনৌয়ে 'বাদশাহী আংটি'র রহস্য সমাধানে তার বেশ নাম হয়। আর তার প্রায় পরপরই মুকুল নামে এক জাতিস্মর ছেলেকে নিয়ে 'সোনার কেল্লা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। মূলত এই কেসের পর থেকেই Prodosh C. Mitter, Private Investigator হিসেবে ফেলুদার স্থায়ী জনপ্রিয়তা।

শুধু চলচ্চিত্রায়নের জন্য নয়। বাঙালি পাঠকের কাছে সোনার কেল্লা স্মরণীয় হয়ে আছে জটায়ুর প্রবেশের কারণে। অনেক গোয়েন্দা চরিত্রেরই এক গুণমুগ্ধ সহকারী থাকে, যার বয়ানে সব কীর্তিকাহিনী লেখা হয়। ফেলুদার ক্ষেত্রে যেমন তোপসে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গী হিসেবে রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু যোগ দেওয়ার পর থেকে ফেলুদার গল্প আরওই স্বাদু হয়ে ওঠে। জটায়ুর তৈরি গোয়েন্দা নায়ক প্রখর রুদ্র এক প্রবল পরাক্রান্ত বীর। কিন্তু সেই মানুষটি নিতান্ত ভালমানুষ। ছোটখাটো চেহারায় আর বন্ধুবাৎসল্যে, আমুদে মেজাজে আর বেফাঁস টিপ্পনিতে সে এক মজার মানুষ। অনেক পাঠকের কাছে ফেলুদার চেয়েও তার আদর বেশি।

ফেলুদার গুণপনার অবশ্য জুড়ি মেলা ভার। এত বিভিন্ন বিষয়ে তার ব্যুৎপত্তি যে তার সম্পূর্ণ ফর্দ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ফেলুদা ভাল পোর্ট্রেট আঁকতে পারে। যোগব্যায়াম করে শরারটা এমন তৈরি রেখেছে যে লালমোহনবাবু রসিকতা করেন, 'গোয়েন্দাগিরিতে ফেল করলে সার্কাসে চাকরি বাঁধা'। রাইফেল শুটিংয়ে চ্যাম্পিয়ান। ডাকটিকিট-সংক্রান্ত নানা খবর জানে। কথার খেলা বা হেঁয়ালিতে জুড়ি মেলা ভার। গাড়ির নাম আর কুকুরের জাত দেখলেই বলে দিতে পারে। স্লো স্পিন বোলার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিমে খেলেছে। প্রায় একশোরকম ইন্ডোর গেম জানে। তাসের ম্যাজিক জানে। একটু একটু হিপনোটিজম জানে। ডান আর বাঁ দু'হাতেই লিখতে জানে। বাংলা স্বরলিপি এবং সব রাগ-রাগিণীর নাম জানে। বাংলা-ইংরেজি দু' ধরনের টাইপোগ্রাফিতে ভাল জ্ঞান। আর কত বলব! ফেলুদা বলেছিল যে ও নিজেকে 'একটি মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক' বলে মনে করে। সত্যিই তাই।

অথচ টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও খাঁই নেই ফেলুদার। নিজেই বলে, 'প্রচুর টাকা রোজগার করব, খুব পয়সায়লা রীচ্ ম্যান হব এমন লক্ষ্য আমার কোনকালেই নেই। কেস তেমন জমাটি হলে রোজগার হলো কি না হলো সেটা আমি ভুলে যাই।' কথাটা নেহাত কথার কথা নয়। ভুবনেশ্বরে রাজারানি মন্দিরের যক্ষীর মাথা বিদেশে পাচারের ব্যাপারে তদন্ত করতে ফেলুদা আওরঙ্গাবাদ অবধি গিয়েছিল এক্কেবারে নিজের খরচে, নিজের আগ্রহে। সুতরাং তেমন তেমন অন্যায় দেখলে ফেলুদাকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সংকোচ করার কোনও কারণ নেই।

আসলে ফেলুদার মধ্য দিয়েই আজকের বাঙালির ইচ্ছাপূরণ। তার ছ'ফুট দু'ইঞ্চির সুদর্শন চেহারা,

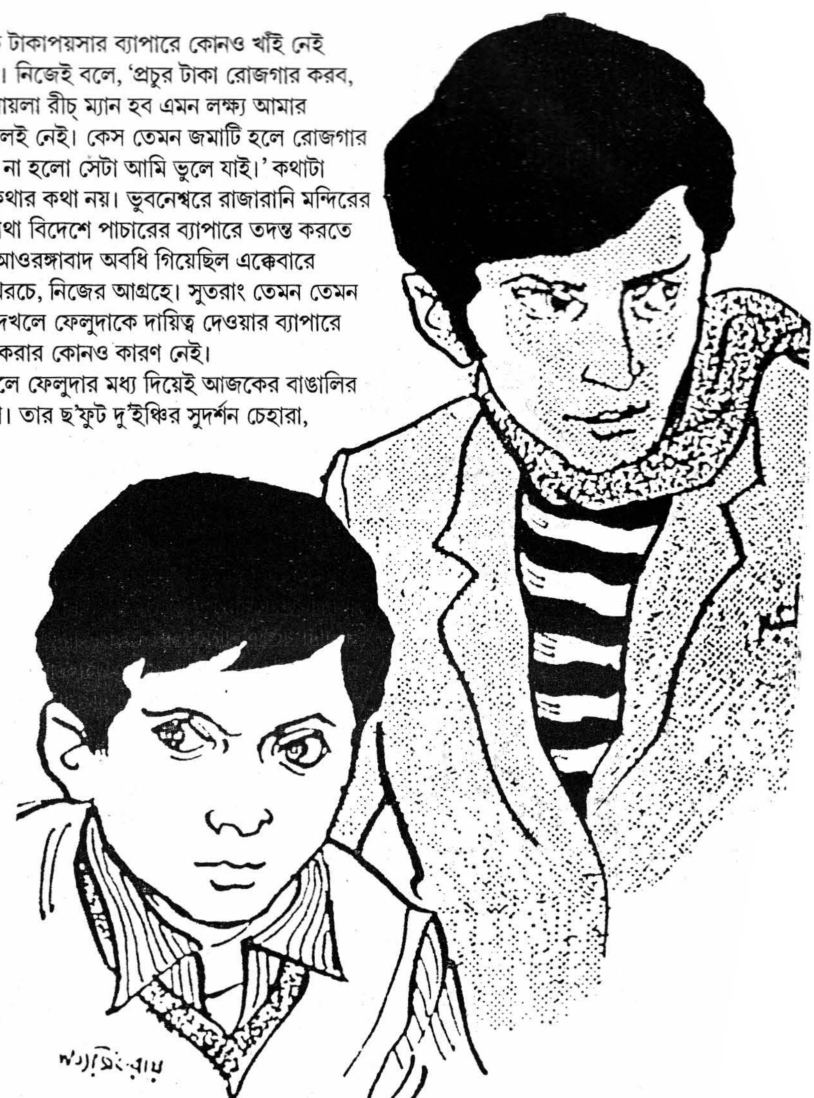

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা আর তোপসে ছবি : সত্যজিৎ রায়

বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, নানা গুণের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং সর্বোপরি রহস্য সমাধানের আশ্চর্য পটুত্ব, বাঙালি পাঠককে দীর্ঘকাল আবিষ্ট করে রেখেছে। এবং আরও দীর্ঘদিন রাখবে।

আর-একজন দাদার কথাও এখানে অবশ্যই বলতে হবে। সে ঋজুদা। বাংলা সাহিত্যে ঋজুদাও এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সর্ব অর্থেই।

পাঠক মহলে তার জনপ্রিয়তার জোয়ারেও বাঁধ পড়ে না একটুও। এখানেই ঋজুদা কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং বিশিষ্টতা।

ঋজুদার গল্প রীতিমত জীবন্ত আর মানবিক হয়ে ওঠে, তার কারণ এর স্রষ্টা বুদ্ধদেব গুহ নিজেও একজন অরণ্য প্রেমিক। তাঁর সবিনয় স্বীকারোক্তি, 'পঞ্চাশবার আফ্রিকা গিয়েও আমরা কেউই আর একখানি চাঁদের পাহাড়ে লিখতে পারব না। তবু কিশোর-কিশোরীদের জঙ্গলের প্রকৃতি সম্পর্কে উৎসাহিত করতে আমাদের লেখালেখি।'

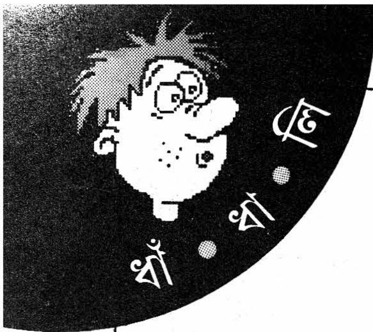

চলে না, তবু দু'বার সঠিক সময় দেয় ঘড়ি

সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় দারুণ ফল করল গোবর্ধন। আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই যোগেনবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "গোবর্ধনকে একটা প্রাইজ দেব। কী প্রাইজ চাই তোমার, গোবর্ধন?"

গোবর্ধন অতিশয় সঙ্কোচ আর বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "একটা ঘড়ি হলে খুব ভাল হয়। তা হলে পড়াশোনাটা ঘড়ি ধরে করতে পারি, সার।"

যোগেনবাবু বললেন, "তাই হবে।"

শিগ্‌গিরই একদিন বিকেলবেলা গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যোগেনবাবু।

কাছেই ঘড়ির দোকান 'এখন সময়'।

এখন সময়ে গিয়ে হরেক ডিজাইনের আর নানান মাপের বিচিত্র সব ঘড়ি দেখতে থাকেন দু'জনে। বাজনা ঘড়ি, হাত ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, দোলন ঘড়ি, লকেট ঘড়ি, আরও কতরকমের ঘড়ি। গোবর্ধনের সবকিছু যেন কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মজার কথা হল, এখন সময়ের কোনও ঘড়িই সঠিক সময় দিচ্ছিল না। সমস্ত ঘড়িই হয় কিছুটা স্লো, নয়তো খানিকটা ফাস্ট। আবার দেওয়ালের এককোণে কেবল একটিমাত্র ঘড়িই ছিল, যা একেবারেই অচল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখাশোনার পর যোগেনবাবু নতুন মডেলের একটা সুন্দর বাজনাদার ঘড়ি পছন্দ করলেন গোবর্ধনের জন্য। যদিও দামটা একটু বেশি, আর তা ছাড়া, ঘড়িটা ঘণ্টায় এক মিনিট করে স্লো যাচ্ছিল। এসব সত্ত্বেও যোগেনবাবুর বেজায় পছন্দ ঘড়িটা।

কিন্তু বাধ সাধল গোবর্ধন। যোগেনবাবুর অত পছন্দের ঘড়িটা নাপছন্দ তার। গোবর্ধনের পছন্দ সেই অচল ঘড়িখানাই।

যোগেনবাবু অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন তাকে। "কী করবে বন্ধ ঘড়ি নিয়ে। ও তো একেবারেই চলে না।"

কিন্তু গোবর্ধনের যুক্তি একটু অন্যরকমের। তার কথা হল, "যে ঘড়িটা ঘণ্টায় এক মিনিট করে স্লো যায়, সেটা তো ২৪ ঘণ্টায় ২৪ মিনিট স্লো যাবে। অর্থাৎ সারাদিনে ঘড়িটা একবারও সঠিক সময় দেবে না। আর ৩০ দিনে ঘড়িটা স্লো যাবে ২৪×৩০=৭২০ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা। তার মানে, ৩০ দিন পর পর, মাসে একদিন করে ওই ঘড়ি সঠিক সময় নির্দেশ করবে। অথচ অচল ঘড়িটা কিছু না হোক, সারাদিনে দু'বার করে সঠিক সময় নির্দেশ করবে। তার মানে, এক মাসে ওই ঘড়ি থেকে ৬০ বার সঠিক সময় নির্ধারণ করা যাবে।"

হার মানলেন যোগেনবাবু। অকাট্য যুক্তি!

গোবর্ধন এর পরে বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ায়, "তবেই বলুন সার, কোন ঘড়িটা নেওয়া যুক্তিযুক্ত?"

সেই কথামতো অচল ঘড়িটাই গোবর্ধনকে প্রাইজ হিসেবে কিনে দিলেন যোগেনবাবু।

গোবর্ধন তো আহ্লাদে আটখানা।

খারাপ ঘড়ির ধাঁধা

গোবর্ধন ঘড়ি নিয়ে, চলাফেরা করে। স্টাইল করে ঘুরে বেড়ায়। তাই দেখে কার না হিংসা হয়! গনশা, গণপতি, রমাকান্ত, সোমানন সকলেই নিজের নিজের ঘড়ি নিয়ে আসে।

একদিন ক্লাসে ঢুকে আমাদের বীজগণিতের সার সরলবাবুর সরল প্রশ্ন অকস্মাৎ গোবর্ধনকেই, "ক'টা বাজে রে গোবর্ধন?"

গোবর্ধন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে থাকে। ওর দশা দেখে ফোড়ন কাটে সকলে মিলে, "গোবর্ধনের ঘড়ির বারোটা বেজেছে, সার। ও সবসময়েই আন্দাজে সময় বলে।"

গনশাই প্রথমে সরলবাবুকে খুশি করতে চায়, "আমার ঘড়িতে এখন বারোটা বাজতে ছ'মিনিট বাকি আছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে গণপতি, "না সার, আমার ঘড়িতে কিন্তু এখন সময় এগারোটা সাতান্ন মিনিট।"

রমাকান্ত বলল, "আমার ঘড়িতে এখন বারোটা বেজে তিন মিনিট হয়েছে।"

প্রায় শেষ কথা বলতে যায় সোমানন। সকলের কথাই নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, "সার, আমার ঘড়ি অনুযায়ী কিন্তু এখন সময় হল বারোটা দু'মিনিট।"

এবারে বিশেষ জটিলতার মধ্যে পড়ে গেলেন সরলবাবু। কার ঘড়িতে সময়টা ঠিক!

আমিই কেবল জানি, ওদের কারও ঘড়িই ঠিক নেই। আসল সময়ের চেয়ে প্রত্যেকের ঘড়িতেই কিছু না কিছু গোলমাল। আমি কারও নাম করে বলছি না। তবে এটুকু বলতে বাধা নেই, একজনের ঘড়িতে দু'মিনিট, একজনের তিন মিনিট, একজনের চার মিনিট, আর একজনের ঘড়িতে পাঁচ মিনিট সময়ের এদিক-ওদিক। অর্থাৎ প্রকৃত সময়ের চেয়ে হয় এগিয়ে, নয় পিছিয়ে।

এখন তোমরা বলো তো, আসল সময়টা কত? আর এটাও বলতে হবে, আসল সময়ের চেয়ে কার ঘড়ি কত মিনিট কম কিংবা বেশি সময় দিচ্ছে।

২১ ফেব্রুয়ারির উত্তর
গোবর্ধনের প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন : ৪৯৯
কারণ, ৪৯৯ = ৪৯৭+২
আবার ৪৯৭×২=৯৯৪
এই সংখ্যাকে উলটিয়ে লিখলে হয় ৪৯৯

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ৪৯
কারণ, ৪৯=৪৭+২
৪৭ আর ২ দুটিই মৌলিক এবং ৪৭×২=৯৪
উলটিয়ে লিখলে ৪৯

তৃতীয় প্রশ্ন : সংখ্যা দুটি ২৪ এবং ৩
কারণ, ২৪+৩=২৭
এবং ২৪×৩=৭২
তা ছাড়া, ২৪ যৌগিক এবং ৩ মৌলিক।

অমল ভৌমিক

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

পাজসবুতা

লুমজুজোর

দমইইলালা

সবহুলবিলা

ক্রেতার অভিযোগ খারাপ জুতো, পাদুকালয় মালিকের জবাব

এবারে পাশের গোল চিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান।

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

টাকা ধার দেওয়ার এই ব্যবসা কি খোলা আছে?

ব ন্ধ কি   ব্য ব সা

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : বলভরসা, গন্ধবিচার, তাপবিকিরণ, অব্যবহার।

ঘোষক

শব্দসন্ধান

সংকেত : পাশাপাশি : (১) চুলের পোকা, কেশকীট। (৩) একে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে হয়। (৫) পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা। (৬) — ধূমকেতুর মতো তার হঠাৎ আবির্ভাব হয়। (৮) দেবতার বাসস্থান। (১০) বর্তমানে এরা কিছুদিন বাদে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। (১১) মহামনা, সম্ভ্রান্ত, অমানিক। (১৩) ধনুকধারী। (১৬) মহাদেবের মাহাত্ম্য নিয়ে লেখা এই কাব্যে শিব চাষির কাজ করেছেন। (১৮) নেই মামার চেয়ে এই মামার কদর বেশি। (২১) অরণ্য। (২৩) ভূতের মুখে শোনা যায় না। (২৫) হেরে যাওয়া, পরাভব। (২৬) পুরাণ পাঠক। (২৭) সম্পত্তি, ঐশ্বর্য। (২৮) জুতাবিশেষ।

উপর-নীচ : (১) মূর্খকে দিলে কোনও কাজ হয় না উপরন্তু সে বিরক্ত হয়। (২) ভাল অভিনয়ে আসল— এক হয়ে যায়। (৩) সুগন্ধি, ফুলের নির্যাস। (৪) এই অরণ্যেই সীতাহরণ হয়। (৫) বিশ্রাম, আনন্দে কর্মহীন আলস্যে থাকা। (৭) বন্যায় দেশের— চূড়ান্ত হয়েছে। (৯) বাতাস সংক্রান্ত। (১২) আবিসিনিয়ার অধিবাসী। (১৪) যার চোখে রঙের তফাত ধরা পড়ে না। (১৫) আড়ষ্টতা, আচ্ছন্নতা। (১৭) শিব। (১৯) খ্যাতিমান। (২০) সম্পত্তির অধিকারী। (২১) কাজ করতে চায় না এমন। (২২) সংকট, ঝঞ্ঝাট। (২৪) শেখালে এ পাখি কথা বলতে পারে।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

র	ত্না	ক	র		কৌ	মু	দী		হ
বি		ল	ব	কু	শ		ন	ফ	র
বা	লি	কা		লা	ল		হী		গৌ
স		তা	প				ন	গ	রী
র	দ		র		বা	স		র্বি	
	গু		খ	র		ন্দে		ত	রু
বা	ক	ল				হ	বি		ই
র		স্বো		শি	স		প	ল	কা
বা	রি	দ		বি	ভা	ব	রী		ত
র		র	সি	কা		হা	ত	খো	লা

বিচিত্র খবর

এস্কিমোরা সাবধান

ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মিকণা এস্কিমোদের ঘাড়ে যত বেশি পড়ে, আমাদের গায়ে তত বেশি লাগে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ১০,০০০ রশ্মিকণা প্রতি মিনিটে আঘাত হানছে। এইসব রশ্মি আসলে তড়িৎকণার স্রোত। তাই পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র তার মেরুর দিকে এই তড়িৎকণাগুলিকে আকর্ষণ করতে থাকে। এইজন্য মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি মহাজাগতিক রশ্মি বেশি ঘনীভূত হয়। কিন্তু বিষুব অঞ্চলে তার প্রভাব খুব কমই থাকে। তাই বিষুব অঞ্চলের অধিবাসীরা মহাজাগতিক রশ্মির বিপদ থেকে অনেক বেশি মুক্ত।

মাছের বিদ্যুৎবাণ

ইল মাছ ইচ্ছে করলে তার গা থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুড়ে দিতে পারে। এর জন্য তার শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দু'রকম অঙ্গ আছে। যখন শত্রুর দিকে বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত করার দরকার হয় তখন প্রায় ৬৫০ ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরি হয়। কিন্তু যখন তারা শিকারের দিকে তড়িৎপ্রবাহ ছুড়ে দেয় তখন তার শক্তি হয় অনেক কম। কারণ, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে আক্রান্ত মাছগুলি ঝলসে গিয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। তাই শুধুমাত্র অবশ করে দেওয়ার জন্য ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহই যথেষ্ট।

চঞ্চল পাল

রহস্যময় বটগাছের বয়স জানা নেই কারও

প্রায় ছ'বিঘা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে খড়ুরগ্রামের বটগাছটি

শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটগাছটির কথা আমরা জানি। আর-এক প্রাচীন বটগাছের কথা জানিয়েছেন নির্মল বসু

বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদের নদী পেরিয়ে বরুণহাটের দিকে যেতে পথে পড়বে খড়ুরগ্রাম। সুন্দরবনের লাগোয়া এই গ্রামটিকে একডাকে সবাই চেনে প্রাচীন একটি বটগাছের জন্য, যে বটগাছের বয়সের হিসেব এক-একজনের কাছে এক-একরকম। কেউ বলে পাঁচশো, কেউ বলে হাজার, আবার কারও- কারও মতে বটগাছটির বয়স তারও অনেক বেশি। ছ'বিঘা জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা বটগাছটি নিজেকে নিয়ে নিত্যনতন রূপকথার মতো নানা গল্প বয়ে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। যার কোনওটা লৌকিক আর কোনওটা অলৌকিক। বর্তমানে বটগাছটির চারধারে ঝুরি নেমে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, তার মূল শিকড় কোনটা, তা আর আজ বোঝার উপায় নেই। এরই মাঝে একটুকরো ফাঁকা জায়গায় আছে পীর গোরাচাঁদের থান। লোকমুখে এ-কথাই চলে আসছে যে, হাজার বছর আগে পীর গোরাচাঁদ একবার এসেছিলেন এই খড়ুরগ্রামে। সেই সময় তিনি বটগাছটির নীচে কাটিয়েছিলেন কয়েকদিন। তারপর থেকেই এই থানের সৃষ্টি। খড়ুরগ্রামের বাসিন্দাদের কোনও অসুখবিসুখ বা অন্য কোনও বিপদ-আপদ হলেই মানতের জায়গা এই পীরবাবার থানটি।

হিন্দু বা মুসলিম কোনও বাছবিচার নেই এখানে। সকলেই বিশ্বাস করেন, এখানে একবার মানত করলে তা সফল হবেই। সেই বিশ্বাসে আজও হাজার দুই বাসিন্দার এই গ্রামটির সকলেই গোরুর বাছুর হলে দুধ দিয়ে পরিষ্কার করে দেয় পীরবাবার থান। বটগাছটির ডাল কাটলেই নাকি মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে এই সংস্কার থাকায়, গাছটির ডাল মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামবাসীদের বাড়িতে ঢুকে পড়লেও তা কাটছেন না কেউ। তাই দিনের পর দিন বটগাছটি তার এলাকা বাড়িয়ে চলেছে, গাছটির ধার থেকে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে মানুষের বসত। কিন্তু বটগাছটিকে নিয়ে গ্রামের মানুষ চিন্তিত অন্য কারণে। কিছুদিন ধরে পিকনিক করতে আসা শহুরে লোকজন তাদের কোনও কথাই মানছে না। দিব্যি বটগাছটির তলায় মাটি খুঁড়ে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করছে তারা। এতে ক্ষতি হচ্ছে গাছটির। তাদের গর্বের বটগাছটির যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি বলে গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ। বহুবার গাছটিকে দেখতে এসেছেন দেশ-বিদেশের বহু মানুষ, এসেছেন বিশেষজ্ঞরা গাছটির নাড়িনক্ষত্র জানতে, তাঁদের মুখেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা শুনেছেন, এত বড় প্রাচীন বটগাছ দেশে বিরল। একে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। কিন্তু আজ অবধি তা কথার কথাই রয়ে গেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

কথা হচ্ছিল খড়ুরগ্রামের বাসিন্দা মমতাজ আলির সঙ্গে। ওই মাঠের একপাশে খড়ুর এফ পি স্কুলের শিক্ষক তিনি। আশপাশের গ্রামের ১৮৮ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে এখানে। তিনি জানান, বছরে দু'বার ইদের নমাজ পড়া ও প্রতি বছর ১২ ফাল্গুন ধর্মসভা হয় বটগাছটির তলায় পীরবাবার থানে। যে ছ'বিঘা জমির ওপর বিশাল বটগাছটি তার ডালপালা ছড়িয়ে বাস করছে বছরের পর বছর, তার ওপর এখন স্কুলের ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি, ধরাচু আর কিতকিত খেলার জায়গা।

বটগাছটিকে নিয়ে প্রচলিত আছে নানা গল্প

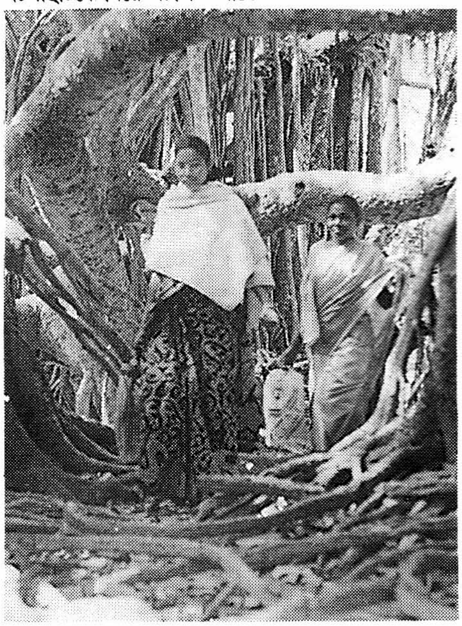

ফোটো : লেখক

লজ্জাবতীর ছলনা

বেশিরভাগ লজ্জাবতী গাছের গায়ে হাত দিলে তাদের পাতা কুঁকড়ে যায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু 'মিমোসা পুডিকা' প্রজাতির লজ্জাবতী গাছে ঘুসি মারলে বা জোরে ঝাঁকুনি দিলে তার পাতা কুঁকড়ে না গিয়ে অন্যদিকে ঘুরে যায়। পাতাগুলি যেদিকে মুখ করে ছিল, ঘা খাওয়ার পর তার উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আঘাত করার পর গাছটা সামগ্রিকভাবে অন্যরকম দেখতে হয়ে যায়। দেখে মনে হয়, যেন কোনও জাদুকর গাছটাকে হঠাৎ পালটে দিল।

কচ্ছপের আয়ু

১৮১০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যখন মাউরিতিয়াস দ্বীপ দখল করে, তখন ফরাসি সেনাবাহিনীর পক্ষে সেখানকার বিশাল একটি কচ্ছপ উপহার পাঠানো হয়। সাম্মানিক নিদর্শন হিসেবে ব্রিটিশরা সেই কচ্ছপটিকে আদর করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও কারণে কচ্ছপটি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। একদিন কচ্ছপটি হাঁটাচলা করতে করতে একটি উঁচু টিলা থেকে নীচে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন ১৯১৮ সাল, অর্থাৎ ১০৮ বছর পরের ঘটনা। কিন্তু যখন তাকে উপহার পাঠানো হয়েছিল তখনই তার বয়স ৭২ বছর পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ, কচ্ছপটি বেঁচে ছিল ১৮০ বছর। দুর্ঘটনায় না পড়লে আরও কতকাল সে বেঁচে থাকত কে জানে!

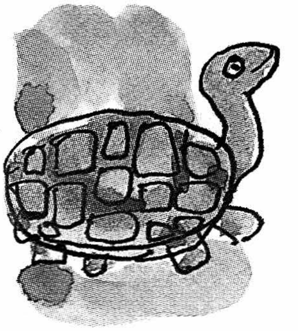

উড়তে শেখা

পাখিরা উড়তে শিখল কীভাবে? একদল বিজ্ঞানী বলছেন পাখিরা আগে মাটিতে খুব জোরে দৌড়তে পারত। ক্রমশ তাদের সামনের দিকে দু'পাশে দুটো ডানা গজাতে থাকে, যা ছোটার সময় দু'পাশে ছড়িতে পড়ত। এভাবে ছুটতে-ছুটতে একসময় তারা হাওয়ায় ভেসে ওঠে, ঠিক যেমন করে এরোপ্লেন মাটিতে ছুটতে-ছুটতে আকাশে উঠে পড়ে। আর একদল বিজ্ঞানী বলছেন, এরকম ডানা গজিয়েছিল ঠিকই, তবে তারা মাটিতে ছুটত না, বানরের মতো এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফিয়ে বেড়াত। ক্রমশ অঙ্গ দুটো প্যারাশুটের মতো বাতাসে ভাসতে শিখিয়ে দেয়। দু' দলের যুক্তিই এত জোরদার যে, এখনও এর সমাধান মেলেনি।

চাঁদ থেকে ছিটকে

চাঁদের ভর কম হওয়ার জন্য মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর ছ' ভাগের এক ভাগ। তার ওপর, বায়ুমণ্ডল না থাকায় বাতাসের ঘর্ষণজনিত বাধাও নেই। তাই চাঁদের মাটি থেকে পাথরের টুকরো চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে মহাকাশে। গণনা করে দেখা গেছে, একটি বড় ধরনের উল্কা চাঁদের মাটিতে এসে পড়লে তার ধাক্কায় চাঁদের মাটির টুকরো এরকম জোরে লাফিয়ে উঠতে পারে। এভাবেই একটি পাথরের টুকরো মহাকাশে ভাসতে-ভাসতে পৃথিবীর অভিকর্ষের আওতায় এসে পড়ে। ফলে তা নেমে এসেছে আন্টার্কটিকায় 'এলিফ্যান্ট মোরেন' অঞ্চলে। পাথরের ফাঁকফোকরে আবদ্ধ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অনুপাত মেপে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, এটি চাঁদেরই।

চিমটির রেশ

যা কিছু জিনিস চোখে পড়ে তার রেশ থেকে যায় ৪৩০ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত। (এক মিলিসেকেন্ড হচ্ছে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ)। অর্থাৎ, কোনও জিনিসকে যদি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় ৪৩০ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে, তা হলে আমরা বুঝতেই পারব না যে জিনিসটা কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। স্পর্শের ক্ষেত্রে এই সময়টা হচ্ছে ২৭০ মিলিসেকেন্ড। অর্থাৎ, কেউ যদি এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার চিমটি কাটে তা হলেও মনে হবে চিমটি কাটা হল একবারই।

তেতো প্রজাপতি

কোনও পাখি বা পতঙ্গভুক প্রাণী 'মনার্ক' প্রজাপতিকে খেতে চায় না। কারণ এদের খেতে যেমন তেতো, তেমনই বিষাক্ত। তার ওপর এত মজবুত শরীর আর কোনও প্রজাপতির নেই। অন্য প্রজাপতিকে আঙুল দিয়ে টিপলেই মরে যাবে কিন্তু মনার্ককে টিপে মেরে ফেলা বা থেঁতলে দেওয়া সহজ নয়। কারণ, এদের দেহ রবারের মতো নমনীয়। এদের শুঁয়োপোকারাও বিষাক্ত। কারণ, এরা যে গাছের পাতা খেয়ে বড় হয় তা এতই বিষাক্ত যে, তৃণভোজী প্রাণীরাও মুখে দেয় না। ফলে, এইসব শুঁয়োপোকা বেশিরভাগই অকালে মরে না।

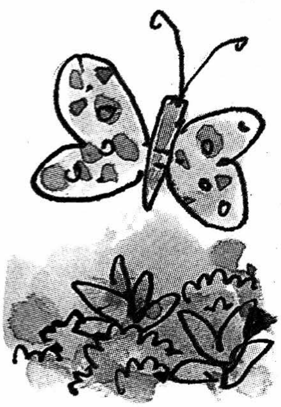

চঞ্চল পাল

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

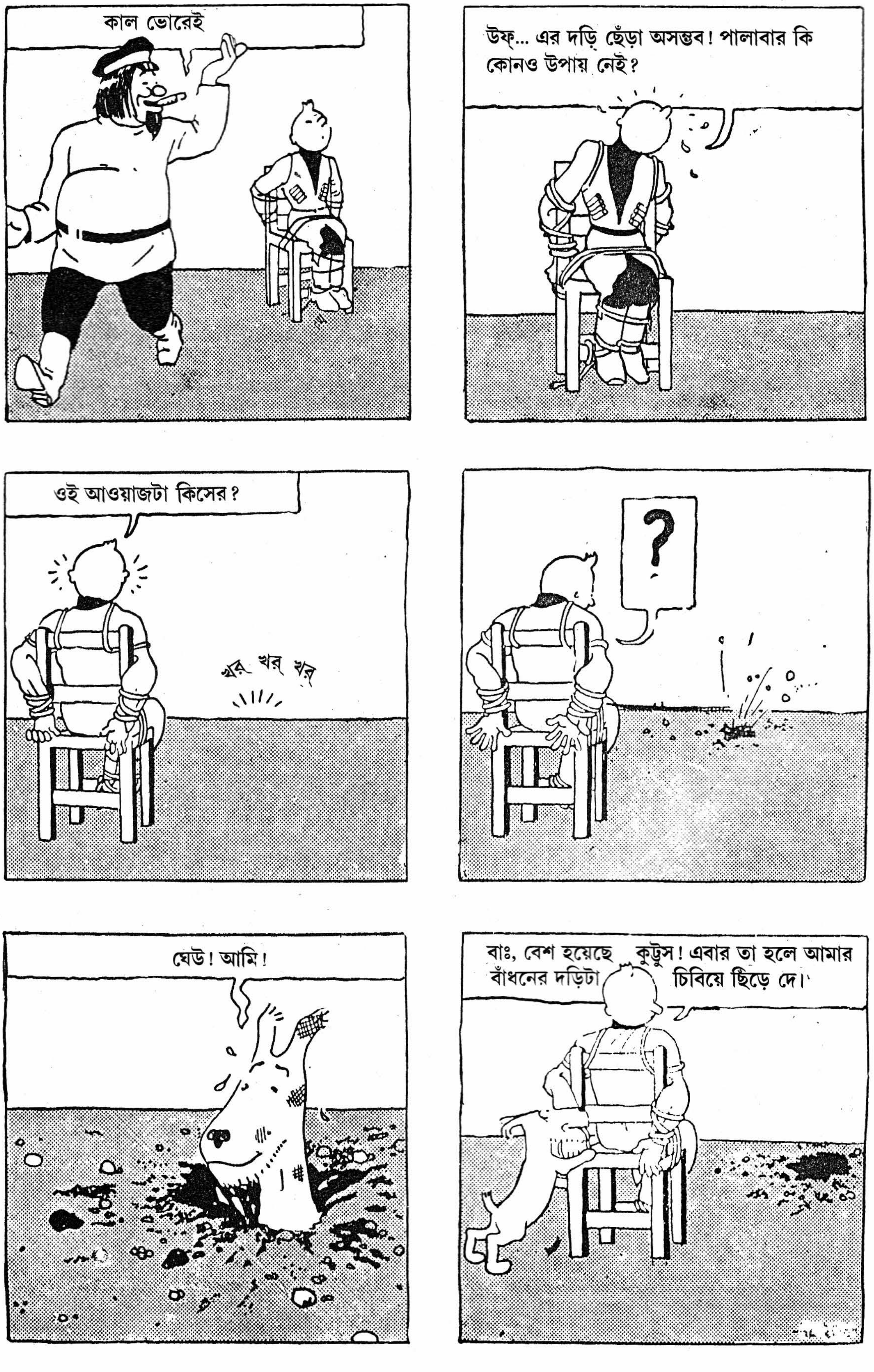
কাল ভোরেই
উফ্... এর দড়ি ছেঁড়া অসম্ভব! পালাবার কি কোনও উপায় নেই?
ওই আওয়াজটা কিসের?
খর্ খর্ খর্
?
ঘেউ! আমি!
বাঃ, বেশ হয়েছে কুট্টুস! এবার তা হলে আমার বাঁধনের দড়িটা চিবিয়ে ছিঁড়ে দে।

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

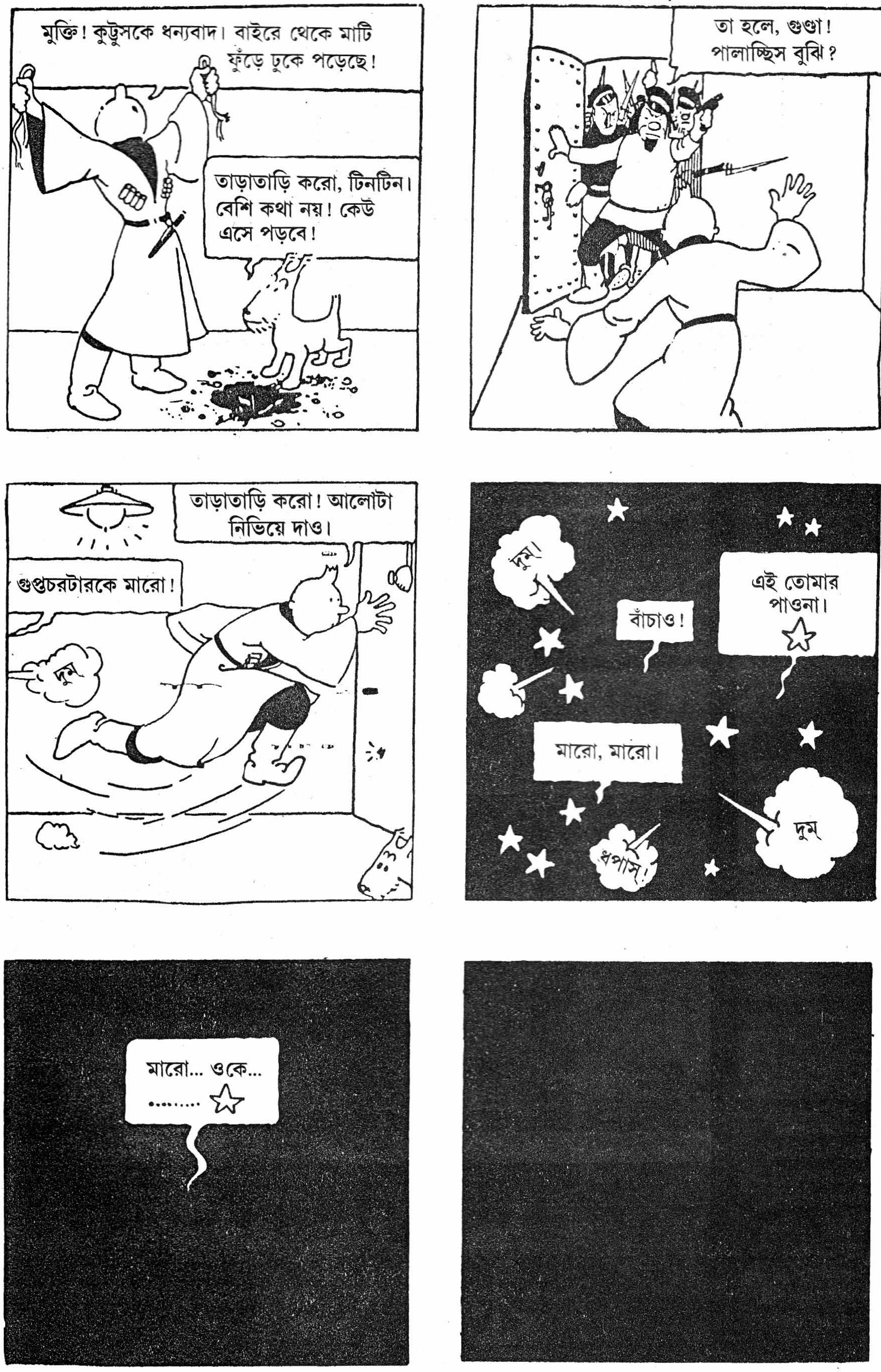

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস এ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোমান সৈনিক অ্যাসটেরিক্স

গল্প গোসিনি
ছবি ইউদেরজো

কপিরাইট : দারগো এডিটর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

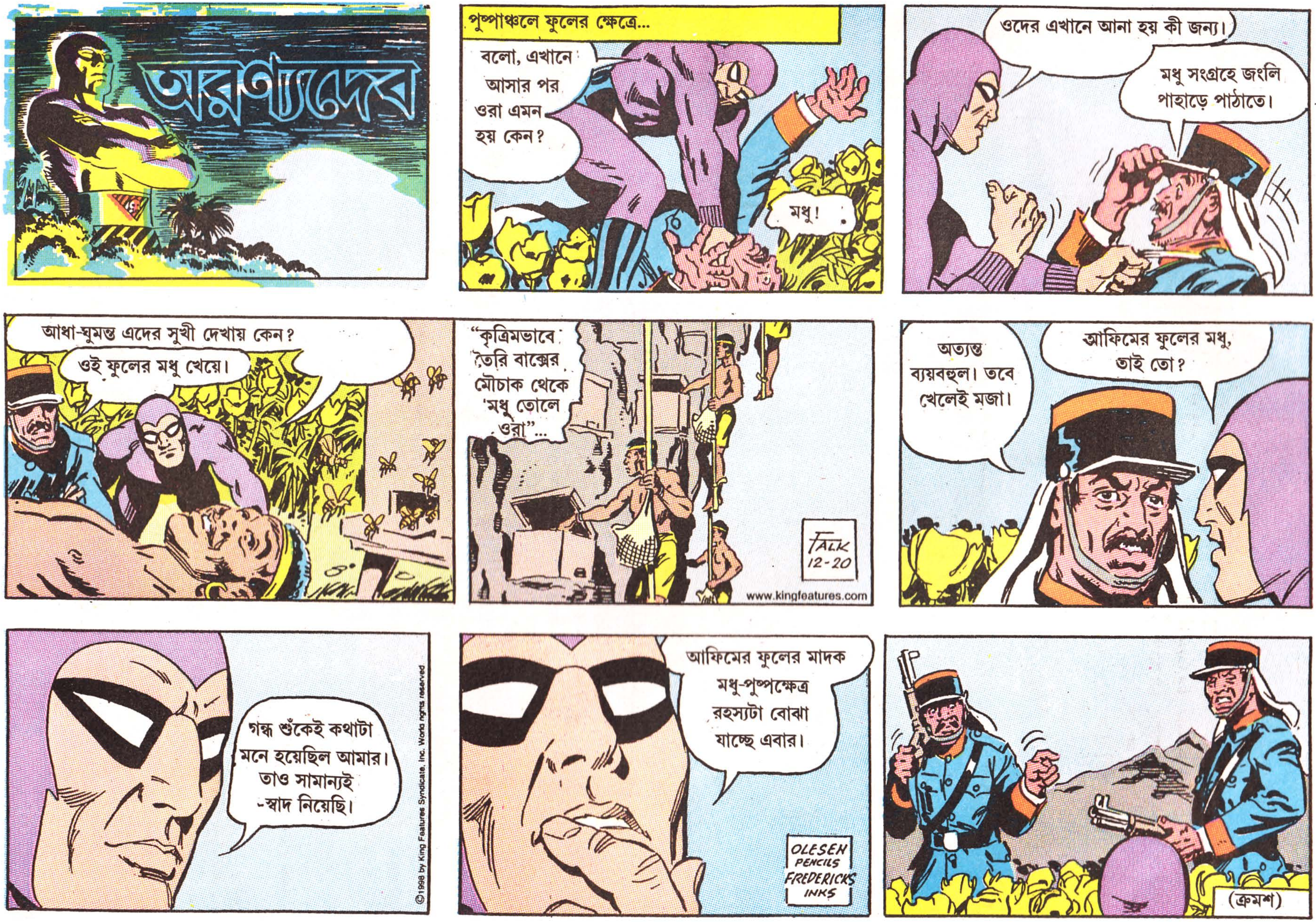
অরণ্যদেব
পুষ্পাঞ্চলে ফুলের ক্ষেত্রে...
বলো, এখানে আসার পর ওরা এমন হয় কেন?
মধু!
ওদের এখানে আনা হয় কী জন্য।
মধু সংগ্রহে জংলি পাহাড়ে পাঠাতে।
আধা-ঘুমন্ত এদের সুখী দেখায় কেন?
ওই ফুলের মধু খেয়ে।
"কৃত্রিমভাবে তৈরি বাক্সের মৌচাক থেকে 'মধু তোলে ওরা"...
FALK 12-20
www.kingfeatures.com
আফিমের ফুলের মধু, তাই তো?
অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে খেলেই মজা।
গন্ধ শুঁকেই কথাটা মনে হয়েছিল আমার। তাও সামান্যই -স্বাদ নিয়েছি।
©1998 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved
আফিমের ফুলের মাদক মধু-পুষ্পক্ষেত্র রহস্যটা বোঝা যাচ্ছে এবার।
OLESEN PENCILS FREDERICKS INKS
(ক্রমশ)

গত সংখ্যার উত্তর

১. কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের এই পুরস্কার পেলেন সিঙ্গরাউলি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিল্প ইউনিটের কর্মী দিলীপ কৃষ্ণন। দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।
২. ভূকম্পে বিধ্বস্ত গুজরাতের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সাহায্যার্থে এই দৌড়, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'রান ফর গুজরাত'।
৩. প্যারিসের দক্ষিণে অর্লিয়ঁ-র বাসিন্দা ক্রিশ্চিয়ান হুরাল্ট।
৪. দূরশিক্ষা বা ডিসটান্স লার্নিং-এর প্রথম কেন্দ্র কলকাতায় উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
৫. হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলি ক্র্যাম। ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি।

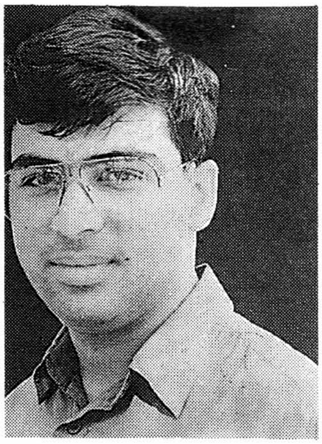

৬. বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান বিশ্বনাথন আনন্দ। আলেখিন দাবা ক্লাবের রজত জয়ন্তীর সূত্রে এসেছিলেন এ শহরে।
৭. তিব্বতি নববর্ষ শুরুর দিন। 'লামা লোসার' শব্দের অর্থ গুরুর দিন। দিনটি পূজনীয় দলাই লামাকে উৎসর্গ করে।
৮. করবেট জাতীয় উদ্যানে। চোরাশিকারিদের আক্রমণে সম্প্রতি কয়েকটি হাতির মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতেই সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থা।
৯. লেডি অ্যাক্টর। ১৯২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।
১০. জিরাফ।
১১. মাও জে দং।
১২. টুয়াটারা।
১৩. অস্ট্রেলিয়ার ল্যাম্বার্ট হিমশৈল।

কুইজ

প্রশ্ন

১. বিশ্বের সবচেয়ে কমবয়সী সফ্‌টওয়্যার এঞ্জিনিয়ার এখন কে? এর আগে কে ছিলেন?
গৌরব সেনগুপ্ত, পলতা, উত্তর ২৪ পরগনা।
২. কম্পিউটারে মিনিটে ১৮৪টি শব্দ লিখতে পারে সে। নাম উঠেছে লিমকা রেকর্ড বুকে। এবার নাম উঠতে যাচ্ছে গিনেস বুকে। বয়স মাত্র ১১। কে এই ছেলে? কোন খেলোয়াড়ের ভক্ত?
লক্ষ্মীকান্ত পোদ্দার, আড়ংঘাটা, নদিয়া।

৩. পাকিস্তানের লাহোরে কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে রংবেরঙের ঘুড়ির বাহারে। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে— সবাই মেতে ওঠে এ উৎসবে। এবারেও পালিত হয়েছে ওই উৎসব। কোন উৎসব?
এমদাদ আলি, সুগন্ধা, হুগলি।
৪. রানি এলিজাবেথ সক্ষোভে সম্প্রতি জানিয়েছেন, এদের শায়েস্তা করা না হলে বাকিংহাম প্রাসাদ ছেড়ে তিনি চলে যাবেন উইন্ডসর ক্যাসেলে। কী জন্য ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ রানি? ব্যাপারটা কী?
লোপামুদ্রা চক্রবর্তী, গয়েশপুর, নদিয়া।
৫. ১৭০৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয়েছিল প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন এই মুঘল সম্রাটের। কে ইনি?
জবা গুহরায়, যাদবপুর, কলকাতা।
৬. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জার্মান একনায়কতন্ত্রী নেতা অ্যাডলফ হিটলারকে তোষণ করছেন বলে অভিযোগ তুলে ইস্তফা দেন এই ব্রিটিশ মন্ত্রী। কে ইনি?
জগবন্ধু পাত্র, বড়বাজার, মেদিনীপুর।
৭. ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁর। শিক্ষা কলকাতা ও লন্ডনে। ব্যারিস্টার হলেও জড়িয়ে পড়েন বামপন্থী আন্দোলনে। দীর্ঘকাল ধরে সাংসদ ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও হন। সম্প্রতি প্রয়াত হলেন ৮৩ বছর বয়সে। কে ইনি?
তাপস পোদ্দার, পার্কসার্কাস, কলকাতা।
৮. সিরাজদ্দৌলাকে বলা হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। কিন্তু ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করে বাংলার শেষ নবাব কে?
রণজিৎ বর্মন, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
৯. "'অসম্ভব' এই কথাটা লেখা থাকে মূর্খের অভিধানে।" কে বলেছিলেন?
অরবিন্দ মণ্ডল, অন্ডাল, বর্ধমান।
১০. তিতুমিরের আসল নাম কী ছিল?
তপন কর, শিবপুর, হাওড়া।
১১. ম্যাকমেহন লাইনের অর্থ কী?
শম্পা মজুমদার, শ্রীরামপুর, হুগলি।
১২. ব্রিটিশ ভারতে লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড ব্যবস্থার প্রচলন করেন কে?
নিতাই দেবনাথ, ধপধপি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

এবারের বিষয় : সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

প্রশ্ন

১. বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাট্সম্যান ডন ব্রাডম্যানের জন্ম কবে? কোথায়?

২. যে শহরে সার ব্রাডম্যানের ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছিল ছেলেবেলায়, আজ সেই শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান ব্রাডম্যান মিউজিয়াম। এ কোন শহর?

৩. ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ব্রাডম্যানকে রোখার জন্য ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বের করেছিলেন এক থিয়োরি। ব্যাপারটি হল লেগের দিকে এক ঝাঁক ফিল্ডার রেখে ব্যাট্সম্যানের শরীর লক্ষ্য করে শর্টপিচ বল করে যাওয়া। ক্রিকেটের ইতিহাসে এই থিয়োরি কী নামে কুখ্যাত?

৪. ১৯৩২ সালে ব্রাডম্যানদের অস্ট্রেলীয় দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন? কোন বোলারকে ব্রাডম্যানকে রোখার প্রধান অস্ত্র করেছিলেন এই ক্যাপ্টেন? ফল কী হয়েছিল?

৫. পর পর ছ'টি টেস্টে শতরান করেছিলেন ব্রাডম্যান। কোন দেশের বিরুদ্ধে?

৬. এক সিরিজে ৯৭৪ রান করেছিলেন সার ব্রাডম্যান। এ এক রেকর্ড। কোন দেশের বিরুদ্ধে? কত সালে?

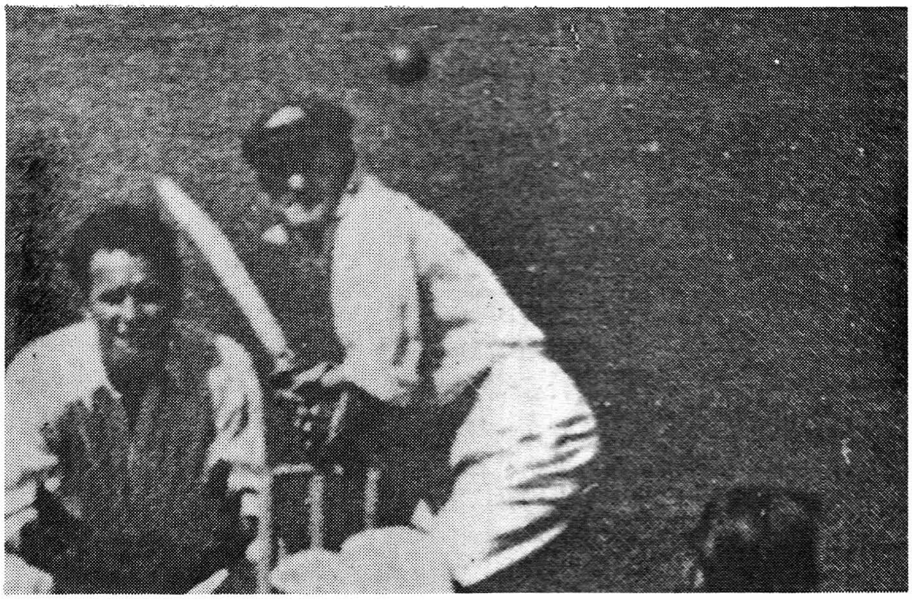

৭. সবচেয়ে কম সময়ে দ্বিশত রান ব্রাডম্যান করেছিলেন কোন দেশের বিরুদ্ধে? কবে?

৮. একদিনে ৩০৯ রান! প্রায় অবিশ্বাস্য এই রান কোন ম্যাচে করেছিলেন ব্রাডম্যান?

৯. বিশ্বের কোন ক্রিকেটার প্রথম নাইটহুড প্রাপ্ত হন? কত সালে?

১০. জীবনে প্রথম কোন খেলায় শতরান করেন ব্রাডম্যান?

১১. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্রাডম্যানের অভিষেক কবে? কত রান করেছিলেন?

১২. অপরাজিত ৪৫২ রান। আজও অস্ট্রেলীয় রেকর্ড হয়ে আছে এ রান। কোন খেলায় করেন ব্রাডম্যান?

১৩. ব্রাডম্যান বিবাহ করেছিলেন কাকে? কত সালে?

১৪. ব্রাডম্যানের ছেলে ও মেয়ের জন্ম কবে? তাঁদের নাম কী?

১৫. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্রাডম্যানের শততম সেঞ্চুরির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী?

১৬. জীবনের শেষ ইনিংসে কত রান করেছিলেন ব্রাডম্যান? আউট হন কার বলে?

১৭. সাধারণ মানুষের নজর এড়াতে ডনের ছেলে জন পদবি বদল করেছিলেন। কী পদবি নিয়েছিলেন?

১৮. ৫২টি টেস্টে ৮০ ইনিংস খেলে ব্রাডম্যানের রান কত? ব্যাটিং গড়? শতরান ক'টি?

উত্তর

১. ১৯০৮ সালের ২৭ অগস্ট। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর কুটামুন্দ্রায়। ২. শহরটি হল বাউরাল। ৩. কুখ্যাত হয়ে আছে বডিলাইন সিরিজ নামে। ৪. ক্যাপ্টেন ছিলেন ডগলাস জার্ডিন এবং ওই বোলার হলেন হ্যারল্ড লারউড। এই সিরিজে ব্রাডম্যানকে রোখা গেলেও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ক্রিকেট-সম্পর্ক। ৫. ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৬. ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালে। ৭. ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। মাত্র ২১৪ মিনিটে। ৮. লিড্‌সে ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৯. বিশ্বের এই সম্মানেরও অধিকারী সার ডন। ১৯৪৯ সালে। ১০. ১৯২০ সালে বাউরাল স্কুলটিমের হয়ে খেলায়, মিটাগংয়ের বিরুদ্ধে। ১১. ১৯২৭ সালে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর হয়ে খেলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। রান করেন ১১৮ এবং নট আউট ৩৩, সাত নম্বর ব্যাট্সম্যান হিসেবে খেলতে নেমে। ১২. ১৯৩০ সালে। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর হয়ে কুইন্সল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১৩. কৈশোরের বন্ধু জেসি মেঞ্জিসকে। ১৯৩২ সালে। ১৪. ছেলে জন, জন্ম ১৯৩৯। মেয়ে শার্লি, জন্ম ১৯৪১। ১৫. ১৯৪৭ সালে সিডনিতে ভারতের বিরুদ্ধেই শততম সেঞ্চুরি করেন ব্রাডম্যান। ১৬. ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হন হোলিস-এর বলে। ১৭. ব্রাডসেন। ১৮. ৬৯৯৬ রান। গড় ৯৯.৯৪। শতরান ২৯টি। সর্বোচ্চ ৩৩৪।

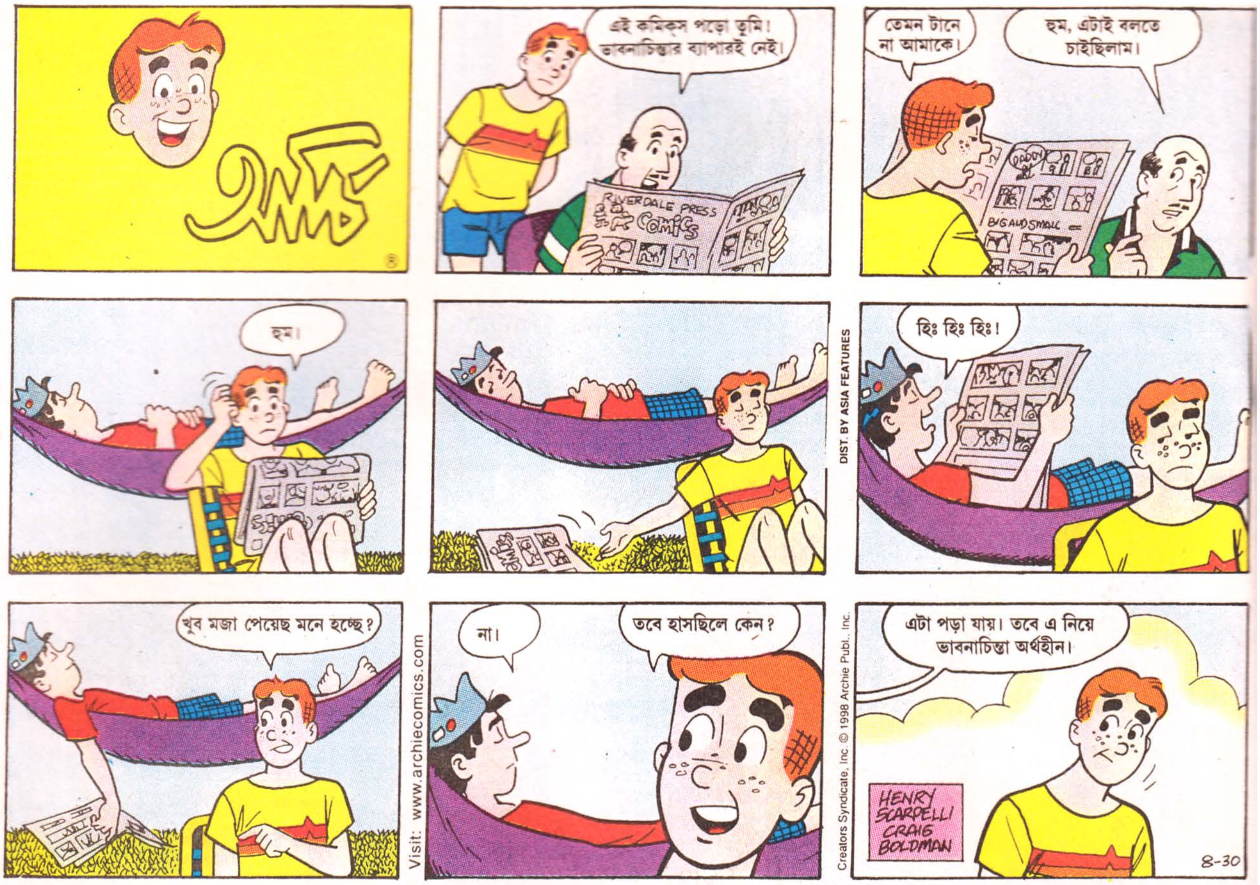
আর্চি
এই কমিক্‌স পড়ো তুমি! ভাবনাচিন্তার ব্যাপারই নেই।
RIVERDALE PRESS
COMICS
তেমন টানে না আমাকে।
হুম, এটাই বলতে চাইছিলাম।
BIG AND SMALL
হুম।
হিঃ হিঃ হিঃ!
DIST. BY ASIA FEATURES
খুব মজা পেয়েছ মনে হচ্ছে?
Visit: www.archiecomics.com
না।
তবে হাসছিলে কেন?
Creators Syndicate, Inc. © 1998 Archie Publ., Inc.
এটা পড়া যায়। তবে এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা অর্থহীন।
HENRY SCARPELLI CRAIG BOLDMAN
8-30

গাবলু
চমৎকার! দারুণ মেরেছ!!
গাবলু, ফেলতেই হবে কিন্তু!
পেরেছে, পেরেছে, গাবলু পেরেছে!
9-10

সত্যজিৎ রায়ের নিদর্শন নিয়ে এক অভিনব সংগ্রহশালা

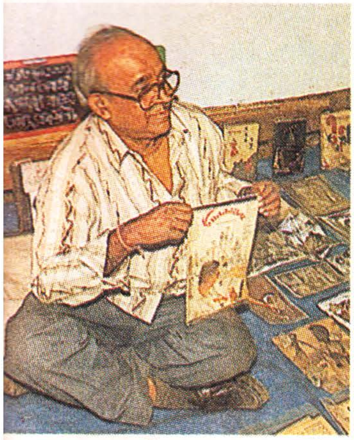

সত্যজিৎ রায়ের তথ্যপ্রদর্শনীতে হারাধন মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র নির্মাণ, ছবি আঁকা, সুর সৃষ্টি থেকে সাহিত্য সৃষ্টি— সব কিছুর নিদর্শনই আছে সংগ্রহশালায়। জানিয়েছেন অজয় দাস

ফোটো : লেখক

সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে কিছু প্রশ্ন প্রায়ই মনে আসে। অনুসন্ধিৎসু মনে তাই প্রশ্ন আসে —'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশে খুদে সত্যজিৎ কাকা সুবিনয় রায়কে কেমন করে সাহায্য করতেন? বা সন্দেশের জন্য তিনি কেমন ভাবে ছবি আঁকতেন? শৈশব থেকে যৌবন, কেমন কেটেছে সত্যজিতের? তিনি জীবনের প্রথম চার দশকে কতটা মগ্ন ছিলেন চলচ্চিত্রে? বা কেমন করে সত্যজিৎ হয়ে উঠলেন চলচ্চিত্রকার? চলচ্চিত্র নির্মাণ, ছবি আঁকা আর সুর সৃষ্টির মাঝে কখন সত্যজিৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে এগিয়ে এলেন? সাহিত্য ভাবনাই বা কী ছিল? সব প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তরের খোঁজ চলছে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি বা নজরুলের মতো সত্যজিৎ রায়কেও জানা তখনও শেষ হয়নি। চলছে সত্যজিৎ গবেষণা। ফিল্মের লোকজনেদের মধ্যে বা যৎসামান্য সাহিত্য জগতে এই গবেষণা চললেও সাধারণ আম জনতার কাছে সত্যজিৎ আজও অজানা। কেই বা এগিয়ে আসবে! পাঠভবনের মতো কয়েকটি স্কুল সত্যজিৎ ভাবনাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালালেও বৃহৎ আকারে কিছু নেই। সত্যজিৎ ভাবনাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার মহান অনুভূতি আর দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বেহালার মানুষ হারাধন মুখোপাধ্যায়। বেহালা বিদ্যাসাগর হস্‌পিটালের স্টাফ হারাধন, ছেলে অর্ণব আর স্ত্রী তৃপ্তিকে সঙ্গী করে নেমে পড়েছেন অজানা সত্যজিতের খোঁজে। ইতিমধ্যেই ওঁর সংগ্রহে এসেছে ১৯৪৩ সালের 'মৌচাক' পত্রিকা, 'শনিবারের চিঠি,' 'প্রবাসী' পত্রিকা, 'বসুমতী,' 'যুগান্তর,' 'রূপাঞ্জলি,' 'উল্টোরথ,' 'দেশ,' 'আনন্দমেলা,' 'আনন্দলোক,' 'বর্তমান,' 'সন্দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্যজিৎ কর্মভাবনার নানা নিদর্শন। সংগৃহীত হয়েছে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত ফিল্মের চিত্রনাট্য, 'সদগতি,' 'পিকু'র চিত্রনাট্য। ১৯৫৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক সেনেট হলে সেই সময়কার তরুণ কবি সাহিত্যিকরা সত্যজিৎকে পথের পাঁচালী করার জন্য যে সংবর্ধনা দিয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে সত্যজিৎকে প্রদেয় মানপত্রের প্রতিলিপি হারাধনবাবু সংগ্রহ করেছেন। রয়েছে 'ক্ষীরের পুতুল,' 'পদী পিসির বর্মী বাক্স,' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,' 'রূপসী বাংলা,' 'বিবির বন্ধু,' 'এক্ষণ,' 'আম আঁটির ভেঁপু,' 'কবি রামকৃষ্ণ,' 'বনলতা সেন,' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সহ ৪০টি বইয়ের প্রচ্ছদ। যা সত্যজিৎ বিভিন্ন সময়ে এঁকেছেন। 'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত,' 'অপুর সংসার,' 'পরশ পাথর,' 'তিন কন্যা,' 'জলসাঘর' প্রভৃতি নিয়ে ৪০টির বেশি বুকলেট, সত্যজিতের লেখা— কৈলাসে কেলেঙ্কারি (দেশ), পথের পাঁচালী— অস্কার (সানন্দা), Man created God (Statesman) প্রভৃতির পেপার কাটিং। আর আনন্দমেলায়— সত্যজিৎকে নিয়ে কভার স্টোরি সহ যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে সব কিছুই রয়েছে হারাধনবাবুর সংগ্রহে। সব মিলিয়ে বেহালার এই মানুষটি সংগ্রহ করেছেন সাড়ে তিন হাজারের বেশি সত্যজিৎ-নিদর্শন। ৫৪ বছরের এই মানুষটি আজও সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছেন। প্রতিদিন কাজের ফাঁকে সত্যজিৎ-সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আর তাঁর সঙ্গে রয়েছে ১৯৪৩-২০০১ সাল অবধি সত্যজিৎ রায়ের তথ্য শীর্ষক প্রদর্শনী।

এই মহান কাজে কীভাবে এগিয়ে এলেন? সন্দীপ রায়ের লেখা 'আমার বাবাকে যেমন দেখেছি' লেখাটির নবম ধারাবাহিক পড়তে পড়তে হারাধনবাবু জানালেন, ১৯৫৯ সালে রূপবাণী সিনেমা হলে 'অপুর সংসার' দেখার পর সত্যজিৎ সম্পর্কে অনুপ্রেরণা জন্মায়। তখনই ইচ্ছা জাগে মানুষটি সম্পর্কে জানব। একদিকে সত্যজিৎ সম্পর্কে পড়াশোনা আর অন্যদিকে চলে সংগ্রহ। ওঁকে দেখার জন্য এদিক-সেদিক ছুটে গেছি। দীর্ঘদিনের পড়াশোনা ও সংগ্রহের পর ১৯৯৭ সালের বইমেলায় প্রথম সত্যজিৎ-নিদর্শন নিয়ে প্রচার শুরু করি। মানুষকে সত্যজিৎ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই আমার এই প্রদর্শনী। এখনও পর্যন্ত ২৮টি প্রদর্শনী করেছি। যেখানে মেলা বা বড় কোনও অনুষ্ঠান হয় সেখানেই ছুটে যাই। প্রতিদিন নিদর্শনগুলি পরিবর্তন করে দেখাই। অসংখ্য স্কুল, কলেজ থেকেও ডাক আসে। সেখানেও প্রদর্শনী করি। তবে কোনও খরচ নিই না। নিজের খরচেই করি। একটি ডায়েরি এগিয়ে দিয়ে তিনি আরও জানান, "দেখুন, মানুষ আমার প্রদর্শনী দেখে কী লিখেছে। টাকা পয়সা চাই না, এই তো বড় পাওনা। বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সহকর্মীরাও আমাকে সাহায্য করেন। ওঁদের কথাও লিখবেন। সন্দীপ রায় থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত অসংখ্য গুণী মানুষ আমার এই প্রদর্শনী সম্পর্কে জানেন।" সত্যজিৎ ভাবনাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার এই কাজকে কেবল নিছক একটা কাজই বলা হবে, না মহান কাজ বলা হবে? এও তো ডিগ্রিবিহীন এক গবেষণা, যার নম্বর দেবে আমজনতা। এই প্রশ্নের মধ্যেই কানে আসে হারাধন বাবুর সেই কণ্ঠস্বর, "আসুন,আসুন, দেখে যান মহান সত্যজিৎ রায়ের মহান কর্মজীবনের ঘটনাবলী। পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক...।"

আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের দোকান বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবল

সারা আমেরিকায় এই বইয়ের দোকানের আছে ৫০০টিরও বেশি শাখা। এখানে বই দেখা ও কেনার অভিজ্ঞতাই আলাদা। লিখেছেন সুদর্শনা সেন

বার্নস অ্যান্ড নোবলের চেষ্টা, বই কীভাবে বিক্রি করা যায় তা নয়, কী করে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানো যায়

আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইয়ের দোকান বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবল। ১৮৭৩ সালে এই দোকান প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কে। তারপর সারা দেশে এর শাখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যে তৈরি হয় বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবল। এখন আমেরিকায় মোট এই দোকানের সংখ্যা ৫০০-রও বেশি।

এখানে বেশ কিছু বড় বড় বইয়ের দোকান আছে। ওপর ওপর দেখলে এগুলি মোটামুটি একই রকম। প্রতিটি দোকানেই অনেক বই বিষয় ভাগ করে সাজানো আছে। আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ, কফি খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এদের চেয়ে বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবল যে আলাদা, তা এককথায় বোঝানো মুশকিল। তাই একবার এই দোকানে সশরীরে উপস্থিত হতে হয়। বিশাল জায়গা জুড়ে প্রচুর বই বড় বড় র‍্যাকে সাজানো। প্রতিটি র‍্যাকের ওপর বইয়ের বিষয় লেখা আছে। সেখানে শুধু সেই বিষয়েরই বই। মাঝখানে বা একধারে একটু উঁচুতে তৈরি দ্বীপের মতো কাঠের রেলিং ঘেরা কফির দোকান। দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে সেখানে উঠতে হয়। এক-একটা কাঠের টেবিল ঘিরে চেয়ার রাখা আছে দু'-চারটে। সেখানে দেশবিদেশের

বহু মানুষ কফি হাতে নিয়ে পড়াশোনা করেন, বই বাছেন। কফির দোকানের মতো মাঝে-মাঝে হাসিঠাট্টাও চলতে থাকে, তবে পাশের জনকে বিরক্ত না করে। একপাশে থাকে 'চিলড্রেন্‌স সেকশন' বা ছোটদের বিভাগ। সেখানে নানা বয়সের শিশুদের বিষয় ভাগ করে বই সাজানো থাকে। পুরো দোকানটাই একটা সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে সাজানো। আর শিশুদের বিভাগ তো বড়দেরও আকর্ষণ করে। সেখানে ঝিকঝিক করে খেলনা ট্রেন চলে, পিস্ বোর্ডের গাছপালা দিয়ে একটা বসার জায়গাও থাকে, থাকে মজার মজার নানা খেলনা, নরম নরম পুতুল। খুব ছোট যারা, তারা ওসব পুতুল জড়িয়ে ধরে বসে মায়ের কাছে ছবির বই দেখে দেখে গল্প শোনে। আর একদিকে ক্যাসেট ও সিডি-র বিভাগ। তার সংগ্রহও কিছু কম নয়। পুরনো ও নতুন গায়কদের গান এখানে থাকে, ফোক, কান্ট্রি, পপ, ক্লাসিকাল এরকম বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে। মাঝে মাঝে একটা দুটো নরম সোফা পাতা আছে। সেখানে পা তুলে আরাম করে বসে লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। এখানে নানারকম ছোটখাটো শৌখিন জিনিসও বিক্রি হয়। যেমন, সুন্দর সুন্দর অ্যালবাম, টেলিফোনবুক, ডায়েরি, কার্ড, পেন স্ট্যান্ড, ফাইল, কফি মগ ইত্যাদি। সেসবও খুব সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। টানা বই পড়তে পড়তে কারও একঘেয়ে লাগলে এইসব শৌখিন জিনিসপত্র ঘুরে ঘুরে নেড়েচেড়ে দেখে একঘেয়েমি কাটানো যায়। বেশকিছু কর্মী ঘোরাঘুরি করে, প্রয়োজন হলে কম্পিউটার দেখে কোন বই কোন র‍্যাকে আছে, বলে দেয়। তবে এত সুশৃঙ্খলভাবে সব বই সাজানো থাকে যে, সাধারণত তার দরকার হয় না।

বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবলের চেষ্টা, বই কীভাবে বিক্রি করা যায় তা নয়, বরং কী করে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানো যায়, তার প্রতিই এখানে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই দোকানে ঢুকলে বই কিনতেই হবে এরকম বাধ্যতা নেই। বহু দেশের বহু মানুষ বহুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে এই দোকানে ঢোকে। কেউ রঙিন পত্রিকা নেড়েচেড়ে দেখে, কেউ রান্নার বই থেকে বিশেষ কোনও রান্না শেখে, কেউ শুধু কফি খায়, আর কেউ কেউ বই কেনে। ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনও ভাষার বই এখানে পাওয়া যায় না। তবে পৃথিবীর বহু বড় বড় কবি-সাহিত্যিকের রচনার ইংরেজি অনুবাদ এখানে রাখা হয়। T দিয়ে টেনিসন প্রমুখ কবিদের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে টেগোর। রবীন্দ্রনাথের বাছাই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।

মানুষের প্রয়োজনে লাগে এমন প্রতিটি বিষয়ের বই এখানে পাওয়া যায়। ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা থেকে শুরু করে দর্শন, শারীরবিদ্যা, ভ্রমণ, সেবা, পৃথিবীর সব ধর্মের পরিচিতি, পোষ্যজীব পালন—কী বিষয়ের বই নেই এখানে! 'Self improvement'-এর বিভাগে কীভাবে নিজের জীবন উন্নততর করা যায়, সেই আত্মোপলব্ধির বিষয়ে বই, আছে কেরিয়ার গাইড। সবই আলাদা আলাদা হেডিং দিয়ে সাজানো। এ ছাড়া আছে পৃথিবীর সব জায়গার মানচিত্র নিয়ে মানচিত্রের বিভাগ। কলা বিভাগে আছে সারা বিশ্বের নাচ-গান ইত্যাদি বিষয়ে বই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার বিভাগ খুব বড়। যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে সেই বিভাগে গিয়ে খুব সহজে কোনও বই তুলে নিয়ে পড়ে, আবার তা ঠিক জায়গায় রেখে দিতে পারে। কিছুটা লাইব্রেরির মতো আবহাওয়া এই দোকানের। নানা বয়সী পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বেশিরভাগই কলেজের ছাত্রছাত্রী। তারা কফি হাতে সামনের চেয়ারে পা তুলে দিয়ে পড়াশোনা করে। কখনও উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলে বোঝা যায়, কোনও কঠিন প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছে তারা। এ ছাড়া পরিবেশ খুব চুপচাপ, শান্ত।

বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবলের এখনকার চেয়ারম্যানের নাম লিওনার্ড রিজিও। আর এর হেড অফিস নিউ ইয়র্কে। যখন প্রথম নিউ ইয়র্কে এই দোকান খোলা হয়, তখন কি কেউ ভেবেছিলেন একদিন তা সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে! প্রতিটি ছোট-বড় অঞ্চলে অন্তত একটা করে থাকবে বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবল! বছর দুই হল এই বিখ্যাত দোকান একটা ওয়েবসাইট চালু করেছে বি এন ডট কম্ নামে। এর দৌলতে তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বইয়ের অর্ডার নিয়ে বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দিচ্ছে। মানুষের শারীরিক উপস্থিতির কষ্টটুকুও তারা বাঁচিয়ে দেয়। এই ইন্টারনেটের সুবিধে বোধ হয় বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবলকে মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

এখন সারা আমেরিকায় হ্যারি পটার সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর কিছু আঁচ বোধ হয় ভারতেও লেগেছে। বইয়ের সঙ্গে হ্যারি পটারের পুতুল, পোস্টার, নোট প্যাড, এরকম বিভিন্ন জিনিসও বিক্রি হচ্ছে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, পশ্চিমবঙ্গে যেমন টিনটিন, অ্যাসটেরিক্স, ইনিড ব্লাইটন খুব জনপ্রিয়, এখানে কিন্তু লোকেরা ভাল করে নামও জানে না এদের। শিশুরা তো নয়ই। তুলনামূলকভাবে অনেক স্থূল রহস্যরোমাঞ্চ মারামারির বই, কমিক্স শিশুরা পড়তে ভালবাসে। সুপারম্যান, ব্যাটম্যান ধরনের, যার মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবনার বা রসবোধের কোনও জায়গাই নেই। আর এখন হ্যারি পটার এসে অন্য সকলকে জয় করে নিয়েছে। সব বয়সের লোকের কাছেই প্রিয় এই বই, বাঙালিদের কাছে যেমন টিনটিন, অ্যাসটেরিক্স। এ ছাড়া ছোটরা টেলিভিশনের কোনও কার্টুন চরিত্রের বা ছোটদের প্রিয় সিনেমার কোনও চরিত্রের ছবি দেওয়া বই পড়তে ভালবাসে। তবে বিক্রির দিক থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল জীবনীমূলক বই।

এই দোকানে প্রায়ই বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা এসে তাঁদের সদ্য লেখা বই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। শিশুসাহিত্যিকরা গল্প বলার আসরের পর ছোটদের বই সই করে দেন। অনেক সময় লেখার ওয়ার্কশপ হয়। যেখানে খ্যাত অখ্যাত সব ধরনের লেখকদের আমন্ত্রণ থাকে।

যে কফির দোকানটি বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবলের অন্যতম আকর্ষণ, তার মালিক স্টারবাকস। আমেরিকা দারুণভাবে জানে কীভাবে মার্কেটিং করতে হয়। বইয়ের রাজ্যে বসে এককাপ ধূমায়িত কফি যে ভাললাগা আরও কত বাড়িয়ে দেয়, তা তারা ভালই জানে। এই ভাললাগাটাই আস্তে-আস্তে পরিচিতি বাড়াতে থাকে, তাই নিজে থেকেই বিক্রি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এখন সারা দেশে বার্ন্‌স অ্যান্ড নোবলের সংখ্যা ৫০০-রও বেশি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তা কততে ঠেকে!

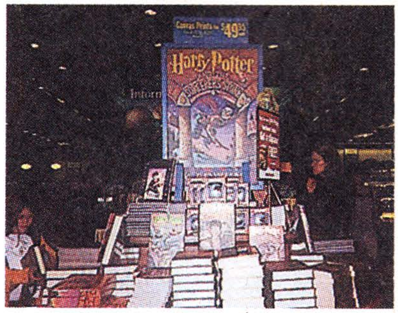

ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, দর্শন, ভ্রমণ— সবধরণের বই আছে এখানে

ফোটো : লেখক

পাখিশিকারি বেড়াল

সামরিক বিমানবন্দরকে সম্পূর্ণ আড়াল রাখার প্রকৃষ্ট উপায় হল বন্যতা। প্রায় নিখুঁত এই উপায়। তবে প্রকৃতি আড়াল করে রাখলেও তার কিছু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাও আছে। যেমন, পাখি। ক্ষিপ্র এবং ছিপছিপে এক জাতের বন্য বেড়াল আছে যাদের পরিচিতি পাখিশিকারের ক্ষমতার জন্য। কিন্তু এই বন্য বেড়ালের একটি পরিবার যারা ইংল্যান্ডে বন্দিদশা অবস্থায় বেড়ে উঠেছে তারা কি তাদের স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে? নিজেদের স্বাধীনতার জন্য এই খাঁচার বেড়ালগুলিকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের মধ্যে সেই স্বভাব আছে, যা তাদের পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবে। এই বেড়ালদের নিয়েই চমকপ্রদ এক অনুষ্ঠান 'টপ ক্যাট'। দেখানো হল ২৬ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে রাত ৯টায়।

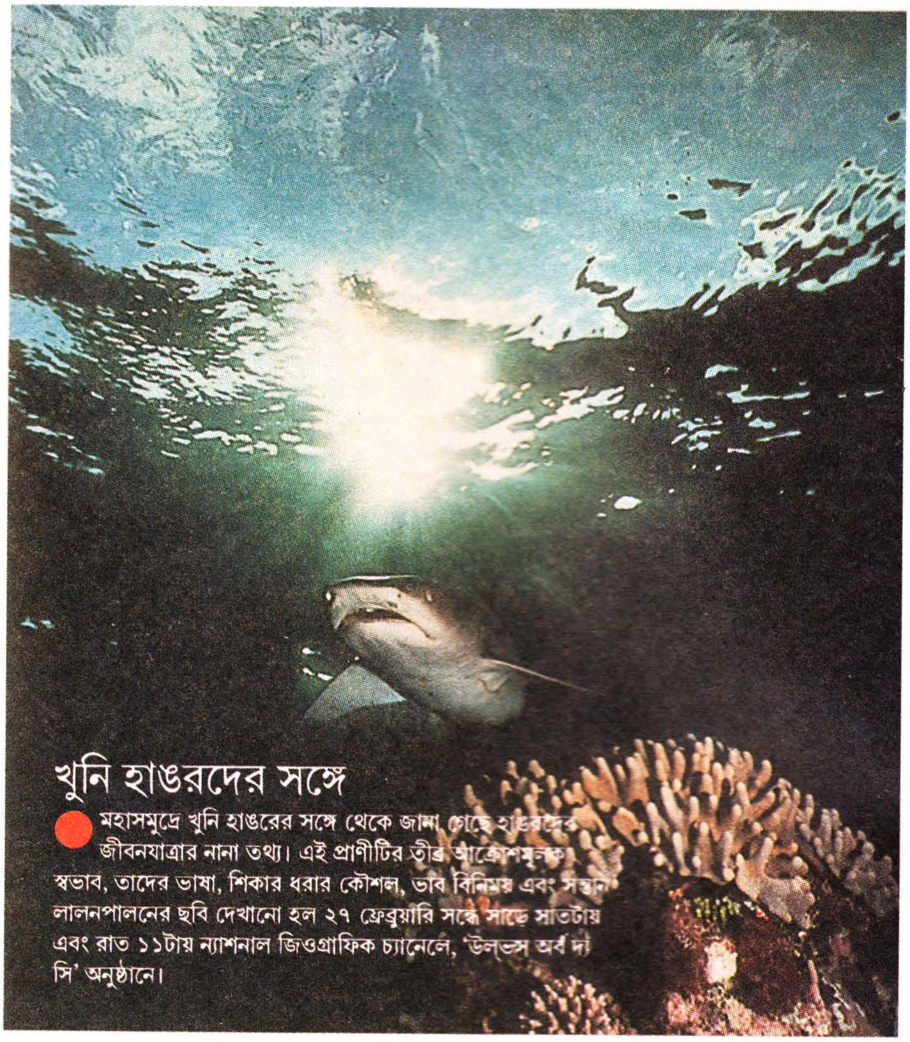

খুনি হাঙরদের সঙ্গে

মহাসমুদ্রে খুনি হাঙরের সঙ্গে থেকে জানা গেছে হাঙরদের জীবনযাত্রার নানা তথ্য। এই প্রাণীটির তীব্র আক্রোশমূলক স্বভাব, তাদের ভাষা, শিকার ধরার কৌশল, ভাব বিনিময় এবং সন্তান লালনপালনের ছবি দেখানো হল ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি সন্ধে সাড়ে সাতটায় এবং রাত ১১টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে, 'উলভস অব দ্য সি' অনুষ্ঠানে।

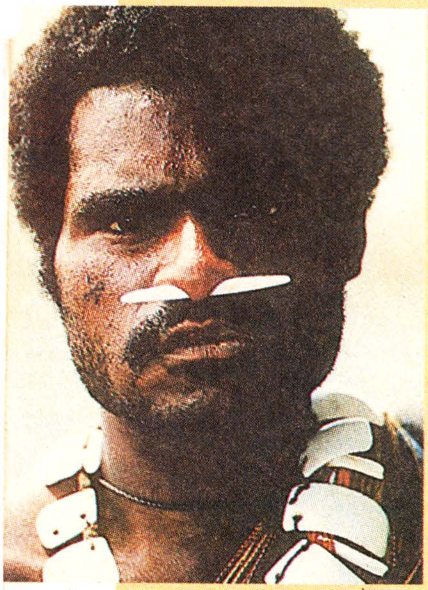

বিষয় মায়া সভ্যতা

এক সময় মায়া সভ্যতার মানুষের একটা শান্তিপূর্ণ ভাবমূর্তি ছিল। কিন্তু সেই ভাবমূর্তি ধীরে-ধীরে ভেঙে গেল যখন মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করলেন যে, সেই সভ্যতা অপ্রত্যাশিতভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই নিয়েই একটি অনুষ্ঠান দেখানো হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধে সাড়ে সাতটায় এবং রাত ১১টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে 'লস্ট ওয়ার্ল্ড লস্ট কিংডম অব মায়া' অনুষ্ঠানে।

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের সৌজন্যে

রোমাঞ্চকর মহাকাশযাত্রা

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক টেলিভিশন দেখিয়েছে, আমেরিকার দুই মহাকাশযাত্রী নর্ম থেগার্ড ও বনি ডানওয়ারের রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ মহাকাশযাত্রার ছবি। তাঁরা রাশিয়ান মহাকাশ স্টেশন মির ১৮ : ডেস্টিনেশন স্পেস'-এ মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক টেলিভিশনের মির ১৮ : ডেস্টিনেশন স্পেস, মহাকাশযাত্রার নানা বিপদ ও ঝুঁকি থেকে শুরু করে দর্শকদের রাশিয়ান মহাকাশ অভিযানের গোপন জগতে নিয়ে যায়। এই অসাধারণ নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে তুলনা চলে অ্যাপোলো এবং সয়ুজের মহাকাশে ঐতিহাসিক মিলনদৃশ্যের। দর্শকরা পরিচিত হন দলের সদস্যদের সঙ্গে। তাঁরা কী ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে তার মোকাবিলা করেছেন। যখন মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের অভিযানের গল্প শোনাচ্ছিলেন, দর্শকরা যেন এক নাটকীয় ঘটনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'ডেস্টিনেশন স্পেস' নামের অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে ২৮ ফেব্রুয়ারি সঙ্গে সাড়ে সাতটায়।

চন্দন রুদ্র

পরিবেশে বাজেট ধাক্কা

প্রকাশিত হল আগামী আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট। কেউ হরষে, কেউ বিষাদে। কেউ এ বাজেটকে আগামী দিনের দিশা বলে অভিহিত করলে, অন্য কেউ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তকে পথে বসানোর বাজেট বলছেন। অর্থাৎ প্রতি বছরের বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলি যথাবিহিত নিয়মেই চলছে। তবে পরিবেশের জন্য এ বাজেটকে খুব একটা সুখকর বোধ হয় বলা যাবে না। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন যে, সিএনজি অর্থাৎ 'কমপ্রেস্‌ড ন্যাচারাল গ্যাস'-এর ওপর আট শতাংশ এক্সাইজ ডিউটি বসবে। এর অর্থ, দেশ জুড়ে যানবাহনজনিত দূষণ কমানোর পেট্রোল, ডিজেলের বদলে সিএনজি ব্যবহারের যে অভ্যাস শুরু হয়েছে, তা যারপরনাই ধাক্কা খাবে। পরিবেশবিদদের মতে, শুধুমাত্র দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো শহরে, যেখানে ইতিমধ্যেই সিএনজি যানবাহন চলছে সেখানেই নয়, বাজেট ধাক্কা পড়বে কলকাতা বা অন্যান্য শহরের পরিবেশেও যেখানে সিএনজি ব্যবহারের কথাবার্তা চলছে।

হারাচ্ছে ম্যানগ্রোভ

গুজরাতের জন্য আবার খারাপ খবর। 'ইন্ডিয়ান স্পেস অ্যান্ড রিসার্চ অর্গানাইজেশন' বা ইসরো সম্প্রতি জানিয়েছে, গত দু'দশকে গুজরাত উপকূলের প্রায় ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অন্তত এক- তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৯৮-এর সাংঘাতিক ঝড় এর অন্যতম কারণ বলে নির্দিষ্ট করা হলেও ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের পেছনে মানুষের ভূমিকাও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। কয়েক বছর আগেও কচ্ছ উপকূলে ১০ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ ছিল, এখন আছে মাত্র একরকম, জানিয়েছেন গুজরাত ইনস্টিটিউট অব ডেজার্ট ইকোলজি'র অধিকর্তা। তাঁর মতে, "যেহেতু এক-একটি প্রজাতি ম্যানগ্রোভের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর সম্পর্ক আছে, তাই এর ফলে সামুদ্রিক জৈববৈচিত্র্যও কমে যাবে।" চিন্তার কথা, ভুজা-এর এই সংস্থাটির গবেষণার বিভিন্ন কাজ প্রায় সদ্য ভূমিকম্পের ফলে বন্ধ।

ইস্যু নাম্বার ওয়ান

গত ডিসেম্বরে জাপানের একটি প্রথম সারির সংবাদপত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সমীক্ষা চালায়। প্রায় তিন হাজার জনকে নিয়ে করা হয় এই সমীক্ষা। ফলাফল বলছে, অন্তত ৭৭ শতাংশ মানুষ যে-কোনও মূল্যে পরিবেশ বাঁচানোকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন। ৬১ শতাংশ মানুষ আগামী দিনের জাপানকে দেখতে চান পরিবেশ-সচেতন দেশ হিসেবে। হিরোশিমা, নাগাসাকির দেশে এমন পরিবেশসচেতনতা অসম্ভব না হলেও, আমাদের দেশের মানুষ এখন কতটা সচেতন! সমীক্ষা হলে মন্দ হয় না।

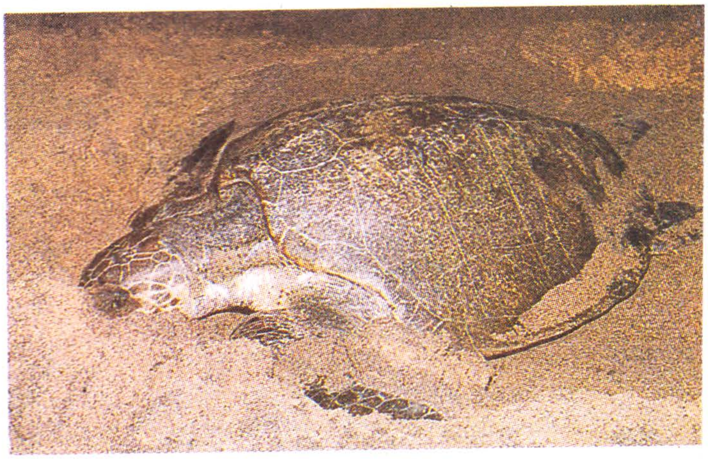

সমস্যায় অলিভ রিডলে

কিছুদিন আগে বিরল প্রজাতির অলিভ রিডলে কচ্ছপ খবর হয়েছিল ওড়িশার উপকূলে বহু বছর পর হাজারে হাজারে দেখা যাওয়ার জন্য। অলিভ রিডলে আবার খবরে, তবে এবার সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম জেলায় ভেদারানায়াম সমুদ্রতটের কাছে প্রায় দু'কিলোমিটার জুড়ে অন্তত ৩০টি অলিভ রিডলের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। এই গণ-মৃত্যুর কারণ কী? বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রের লবণাক্ততার হঠাৎ পরিবর্তন থেকে শুরু করে, নৌবহরের 'রুটিন এক্সারসাইজ', কারণ হতে পারে অনেক কিছুই।

জয়ন্ত বসু

মজার

ভূতেরাই ভয় পেত আমাকে

ভোলানাথ চক্রবর্তী

জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে টেনে ছিঁড়েছিলাম নিজের নাড়ি। এমন ছেলেকে কি ভাল ছেলে বলা যায়! প্রতিদিন সন্ধেবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবার কাছে জুটত বেদম মার। মারতে মারতে রুলকাঠ ভেঙে ফেলতেন বাবা। তা হলেই বুঝে দ্যাখো কেমন ছিলাম ছেলেবেলায়!

জন্মেছি ১৯২৫ সালের ২৬ অগস্ট চুঁচুড়ায় মামার বাড়িতে। বড় হয়েছি আমাদেরই এই হাওড়াতে। পড়েছি এখানকার বিবেকানন্দ স্কুলে। প্রথম থেকেই আমার নীতি ছিল কোনওদিন প্রথম হব না, কেননা তাতে ভারী ঝামেলা! চেয়ার ঠিক রাখতে গিয়ে রাতদিন বই মুখে করে বসে থাকতে হবে যে! খেলাধুলো, দুষ্টুমি এসব করব কখন? তার চেয়ে নয় দশ কিংবা এগারোয় থাকা ঢের ভাল! মাস্টারমশাইরা ছিলেন ভারী ভালমানুষ। আমাদের মতো দুষ্টু ছেলেদের ওপর ছিল বেশি দুর্বলতা। ফুটবল খেলায় ছিল প্রবল উৎসাহ। খেলার মাস্টারমশাই, রাধাকান্তবাবু বিখ্যাত পালোয়ান ভীম ভবানীর শিষ্য ছিলেন। ছুটির শেষে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতাম খেলা দেখতে।

কী বলছ, ভূতের ভয়? ভূতেরাই তো বোধ হয় আমায় ভয় পেত। মামার বাড়ির পাশে একটা পোড়োবাড়ি ছিল। অনেকে আত্মহত্যা করেছিল সেখানে। মামাবাড়ির পাঁচিলের গা দিয়েই ওই পোড়োবাড়ির সামনে বেলগাছ। সারারাত গঙ্গায় নৌকো বাওয়ার পর, ভোররাতে বাড়ি ঢোকার জন্য বেলগাছটাই ছিল একমাত্র উপায়।

মামাবাড়ির পাড়াতেই চাঁপাফুল তুলতে গেছি, সঙ্গে এক মামাতো ভাই। ফুল তোলা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে আছি নীচে। হঠাৎ দড়াম করে শব্দ। মামাতো ভাইটি পপাত ধরণীতলে! জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ রে, পড়লি কী করে?"

সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, "দাদা, তুমি বিশ্বাস করো, চাঁপাগাছের একটা মোটা ডালে যেই পা দিতে গেছি, ও মা, হাওয়া!"

এইরকমই একবার আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম সবাই মিলে। কপাল খারাপ, সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। কিন্তু সরষের মধ্যে ভূত! আমাদের সঙ্গে যে ও.সি.-রই দুই ছেলে। কাজেই সে-যাত্রা শাস্তি মকুব। আরেকবার তো ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম স্বয়ং গৃহকর্তার কাছে। "অ্যাই, ফুল চুরি করেছিস কেন বল?"

"আজ্ঞে, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুজো করব।"

তিনি গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন সে আবার কী ঠাকুর! তিনি যে বিশ্বকবি

সেটা অনেক কষ্টে তাঁর মাথায় ঢোকাতে হয়েছিল।

বাড়িতেই বিরাট চৌবাচ্চায় পোষা থাকত কুমির। একবার কী খেয়াল হল চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত লাঠি দিয়ে তাকে খোঁচাতে লাগলাম। আর যায় কোথায়! চৌবাচ্চা থেকে লাফ দিয়ে সে ধাওয়া করল আমার পেছনে। শেষে তার গায়ে বস্তা চাপা দিয়ে তাকে ধরা হল। আমার প্রাণ বাঁচল। কয়েকজন বন্ধু মিলে একবার ঠিক করলাম দেওঘর যাব। যেই ভাবা সেই কাজ! এক বন্ধুর লঝ্ঝড়ে গাড়িতে চেপে বসলাম সবাই। গলির মোড়ে গিয়ে সে-গাড়ি স্পিকটি নট! ঠেলতে-ঠেলতে তাকে নিয়ে পড়া গেল জি.টি. রোডে, তারপর কোন্নগর। শেষ পর্যন্ত বর্ধমানে এসে সে গাড়ি নট নড়নচড়ন। ভোরবেলা কোনওক্রমে তাকে মেরামত করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম দেওঘর। গিয়ে উঠলাম এক বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে। সব দেখেশুনে ভদ্রলোকের তো মাথায় হাত!

লোককে জব্দ করতেও আমাদের জুড়ি ছিল না। একবার এক বন্ধুর মেয়ে দেখতে গিয়ে নিমন্ত্রিতদের সব খাবার নিজেরাই খেয়ে ফেলেছিলাম। পরে অবশ্য তারাও জব্দ করেছিল আমাদের। নেমন্তন্ন করে হাঁড়িভর্তি বিরিয়ানি পোলাও ধরে দিয়েছিল আমাদের সামনে।

না, ভয়ডর বিশেষ ছিল না। কলেজ পাশ করে কোনওক্রমে কিছু টাকা জোগাড় করে জাহাজে চড়ে ডাক্তারি পড়তে গেলাম বিলেতে। পড়ার টাকা জোগাড় করতে সেখানে রেস্টুরেন্টে কাপ ডিশ ধোয়ার কাজও করতে হয়েছে। পড়ার পাট চুকলে একা একাই ঘুরে বেড়ালাম সারা ইউরোপ।

এখন এই বয়সে পৌঁছেও মাঝেমধ্যেই বাবার সেই মারের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই দাগের ওপর মায়ের নরম হাতের আদরমাখানো স্পর্শ। ছেলেবেলার দুষ্টুমির কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলি।

অনুলিখন : শুক্লা রায়

এখনও চোখে ভাসে ত্রিশ বছর আগের সেই টেস্ট

পলাশ নন্দী
ফোটো : রাধেশ্যাম ঘোষ

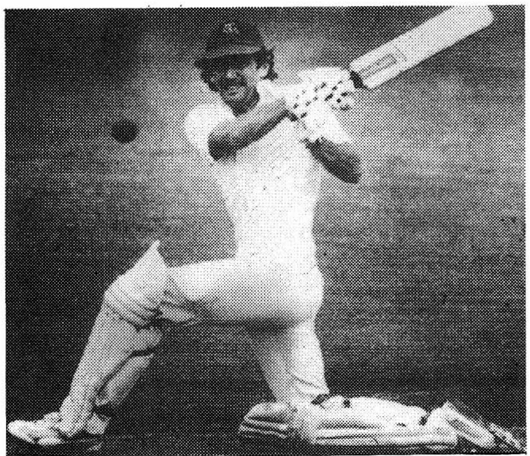

ইয়ান চ্যাপেল

'৬৯-'৭০ সালের হোম সিরিজে ইডেনে ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে চারদিনে টেস্ট জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই টেস্ট নিয়ে লিখেছেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার পলাশ নন্দী

এ মাসের ১১ তারিখ থেকে আমাদের প্রিয় ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, '৬৯-'৭০, '৯৭-'৯৮ সালের মতো এবারেও সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটিই অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতায়। ইডেনে খেলা হলেই মনে জাগে আলাদা অনুভূতি, শিহরন। অস্ট্রেলিয়া চিরদিনই 'গ্ল্যামারাস' দল। ইডেনে যাব সচিন-সৌরভ বনাম ম্যাকগ্রা-ওয়ার্নের লড়াই দেখতে। তবে '৬৯-'৭০ সালের বিল লরির অস্ট্রেলিয়ার খেলার স্মৃতি এখনও মনে গেঁথে আছে, কারণ তখন আমার ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সেই বছর প্রথম আমি বাংলার হয়ে খেলেছি। স্মৃতি রোমন্থন করার সময় কিছু ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত।

অস্ট্রেলিয়ার খেলা বরাবরই আমার ভাল লাগে। ১৯৬৯-'৭০ সালে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল ইডেনে। প্রথম টেস্ট কানপুরে জিতে ভারত এগিয়ে। কানপুরে অভিষেক টেস্টে শতরান করেছিলেন বিশ্বনাথ। ইডেনে টসে জিতে ভারত অধিনায়ক নবাব পটৌডি টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ ইডেনের পিচ ছিল 'টার্নিং ট্র্যাক'। প্রথম দিন খেলার শুরুতেই অতি অল্প রানে ভারতের দু'-উইকেট পড়ে যায়। প্যাভিলিয়নে ফিরে যান বুধি কুন্দরন ও ফারুক এঞ্জিনিয়ার। ফর্মে থাকা 'ভিশি' আসেন ক্রিজে। ম্যাকেঞ্জি, কনোলি, হক, ম্যালেট প্রমুখদের বিরুদ্ধে লড়ে ৫৪ রানের একটি অসাধারণ ইনিংস খেলেন তিনি। ম্যাকেঞ্জির বলে হাঁটু গেড়ে বসে কভার ড্রাইভ এবং ম্যালেটের বলে অসাধারণ লেট কাট প্রমুখ স্ট্রোকগুলি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে। বিশ্বনাথ আউট হতেই ভারতের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে। প্রয়াত অম্বরদা (রায়) বেশ ভাল খেলতে-খেলতে হঠাৎ আউট হয়ে যান। পটৌডি, ওয়াড়েকর প্রমুখরা ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। স্পিনিং ট্র্যাকে দ্বিতীয় ইনিংসে ম্যাকেঞ্জি, কনোলি, নীল হকের দুরন্ত ফাস্ট বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি আমাদের ব্যাটসম্যানরা। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল ভারতের ব্যাটিং।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দলের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিথ স্ট্যাকপোল ও অধিনায়ক বিল লরি। দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন ইয়ান চ্যাপেল (৯৮) ও ডগ ওয়াল্টার্স (৫৪)।ওয়াল্টার্সের দৃষ্টিনন্দন হুক, পুল মনে এখনও দাগ রেখে গেছে। ইয়ান চ্যাপেলের 'কপিবুক' ব্যাটিং নির্ভরতা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া দলকে। চ্যাপেল-ওয়াল্টার্সের যুগলবন্দিতে সেদিন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল ইডেন, আর চোখে পড়ার মতো ছিল কভার পয়েন্টে পল শিহানের ফিল্ডিং। এঁদের যোগ্য সহায়তা করেন রেডপাথ, ফ্রিম্যান, ম্যালেট প্রমুখরা। ম্যাকেঞ্জির ফাস্ট বোলিং ছিল ভয়ঙ্কর। ইডেনের সবুজ গালিচায় ম্যাকেঞ্জি, হক, কনোলি—এই ত্রয়ীর কম্বিনেশন নাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতের ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে পর্যুদস্ত করে টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরায় বিল লরির দল। মাত্র সাড়ে তিন দিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল ইডেনের সেই টেস্ট।

ওই ম্যাচে ঘটেছিল আরও কিছু স্মরণীয় ঘটনা। বোলিংয়ের সময় একবার রুসি সুর্তির হাত ফসকে বল বেরিয়ে গেলে বিল লরি এগিয়ে এসে সেই বলকে সীমানার বাইরে পাঠিয়েছিলেন অবলীলাক্রমে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সুব্রত গুহকে বাদ দিয়ে দলে নেওয়া হয়েছিল বেঙ্কটরাঘবনকে। ফলে ইডেনে প্রথম দিন পোস্টার পড়েছিল "নো সুব্রত নো টেস্ট।" তখন ক্লাব হাউস তৈরি হয়নি। সিজন টিকিটের ব্যবস্থা ছিল না, দৈনিক টিকিট চালু ছিল। প্রায় ৪০ হাজার দর্শক বসার ব্যবস্থা ছিল ইডেনে। শেষ দিন স্টেডিয়ামে প্রচণ্ড গোলমাল হয়। আহত হয়েছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী অনেক দর্শক, যা সত্যি বেদনাদায়ক। সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দল খেলেছিল সম্পূর্ণ নতুন 'পলি-প্লাস্টিক' ব্যাটে। ওই ব্যাট সেবার প্রথম চালু করে ওরা। বিভিন্ন দিক থেকে '৬৯-'৭০ সালের ইডেনে টেস্ট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আজ ৩০ বছর পরেও সেই টেস্টের কিছু ঘটনা মনে স্পষ্ট। যেমন বিশ্বনাথের লেট কাট, ওয়াল্টার্সের পুল, হুক শট, চ্যাপেলের স্কোয়ার কাট, শিহানের ফিল্ডিং এবং ম্যাকেঞ্জির দুরন্ত পেস বোলিং। ২০০১ সালে ইডেনে সৌরভের নেতৃত্বে ভারতের খেলা দেখার সময় হয়তো মাঝে-মাঝে মনে পড়বে সেই ঐতিহাসিক টেস্টের কথা, যা আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল।

অনুলিখন : সুজন ঠাকুরতা

ষোলো বছর ধরে ইডেনের পিচ তৈরি করছেন মহেশ সাউ

কলকাতার ইডেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ। সেই মাঠে যিনি পিচ তৈরি করেন তিনি প্রচারের আড়ালেই থেকে যান। লাজুক সেই মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন গৌতম বাগচী

কলকাতার ইডেন। ১৯৯৩, ২ ফেব্রুয়ারি। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত আবার জয়ের স্বাদ ফিরে পেল। সেদিন ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

এই ঘটনার আগে টানা ১১টি টেস্টে জয়ের মুখ দেখতে পায়নি ভারতীয় ক্রিকেট দল। এর মধ্যে একবার টেস্টে জিতেছিল ১৯৯০-'৯১ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, চণ্ডীগড়ে। তারপর নয় ড্র, নয় হার।

দীর্ঘদিন পর ভারতকে টেস্টে জিতিয়ে আজহার সেদিন সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন। কারণ, তাঁরই অধিনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল—তা নিমেষে থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু কেউ কি জানেন, সেদিন সকলের আগে মাঠ থেকে বেরোবার সময় আজহার যাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর নাম মহেশ্বর মালি বা মহেশ্বর সাউ। সেদিন তিনিও ছিলেন আজহারউদ্দিনের মতো সমান খুশি।

শুধু ইডেনেই নয়, মহেশ্বর সাউ পিচ তৈরি করার ডাক পান যখন-তখন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে। ডাক এসেছিল বাংলাদেশ থেকেও। মহেশ্বরের কথায়, "১৯৮৫ সাল থেকেই সি. এ. বি. আমার ওপর পিচের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সেই থেকেই গত ১৬ বছর ধরে টেস্ট পিচ, ওয়ান ডে পিচ, এমনকী সি. এ. বি'র সব লিগের খেলার পিচেরও তদারকি করতে হয়।"

মহেশ্বর সাউ বা মহেশ্বর মালিকে কলকাতার মাঠে একডাকে সকলেই চেনেন শুধু খেলার দুনিয়ার মানুষরাই নন, অন্যরাও। মুখচোরা মানুষটি নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন কোনওরকম তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না থেকে।

মহেশ্বর কীভাবে পিচ তৈরি করেন? পিচ তৈরি করতে কতদিন লাগে, পিচের জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কী কী জিনিসপত্র লাগে, এসব কথা আমরা তাঁর মুখ থেকে জানার আগে, মহেশ্বর মালির পরিচয় দিই। কীভাবে তিনি পিচের দায়িত্ব

মহেশ সাউ ফোটো : প্রদীপ আদক

পেলেন? কার কাছ থেকে শিখলেন এই বিদ্যা?

১৯৬২ সালে, সম্পর্কে জামাইবাবু কালীঘাট ক্লাবের মালি মদন সাউয়ের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন মহেশ। পেট চালানোর মতো যে-কোনও একটা চাকরি বা কাজের খোঁজে যখন এলেন, তখন ভাবেনওনি এরকম একটা গুরুদায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে। প্রথম প্রথম মদনবাবুর সঙ্গে মাঠের কাজে হাত লাগালেন। মাঠের অনেক কাজ অনায়াসে রপ্ত করে ফেললেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সব দেখতেন আর বোঝার চেষ্টা করতেন। মাঠের প্রতিটি ঘাস চেনার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। পিচ তৈরির পদ্ধতি একদিন আয়ত্ত করে ফেললেন। সেই সূত্রেই প্রথম পিচ তৈরি করেন রাজস্থান ক্লাবের ক্রিকেট পিচ। "সেটাই ছিল আমার দায়িত্বে করা সম্পূর্ণ প্রথম পিচ।" মহেশ জানিয়েছেন। ক্রিকেট পিচ কীভাবে তৈরি হয়, সে-সম্পর্কে জানালেন, "প্রথমে চাই মাটি। সে মাটি আবার যেমন-তেমন নয়। চাই পাঁকমাটি যা ক্রিকেটের পিচের পক্ষে খুবই আদর্শ। একটা সময় এই পাঁকমাটির গুণ ও মান দুটোই ভাল ছিল। এখন সেরকম পাঁকমাটি, প্রকৃত অর্থে, পাওয়া যায় না। কারণ পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য যেসব সার ব্যবহার করা হয় তা মাটিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে এখন আমরা ধানখেতের মাটি ব্যবহার করি পিচের জন্য, যাতে শতকরা ৬৫ ভাগ 'ক্লে' আর ৩৫ ভাগ বেলেমাটি থাকে। এই ভাগটিকে নিখুঁতভাবে মিলিয়ে নিতে হয়। তবে পুরনো পিচের চরিত্র অনুযায়ী তাকে নতুনভাবে তৈরি করতে গেলে কখনও চার থেকে পাঁচ অথবা ২০ থেকে ২৫ গাড়ি মাটি ফেলতে হয়। কারণ, দুই থেকে চার ইঞ্চি গভীর করে মাটি তুলে ফেলতে হয়। এই মাটি তোলার পর দুব্বোঘাস বসানো হয়। এর পর করতে হয় জলের স্প্রে। দুব্বোঘাস জমে গেলে তার ওপর মাটি মিহি করে ছড়ানো হয়। এর পরবর্তী প্রধান কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রথম ভাগে টানা ১৫ দিন হাফ টন অর্থাৎ 'লাইট রোলার' দিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এক টন অর্থাৎ 'হেভি' রোলার দিতে হয়। তবে এই হেভি রোলার টানা হয় সাধারণত ভোরের শিশির থাকতে থাকতে, আবার সন্ধের শিশির পড়ার সময়। আমার মাথায় সবসময় পিচ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে—পিচটা যেন যথাযথ 'স্পোর্টিং' পিচ হয়, কারও পক্ষে বা বিপক্ষে না যায়। এই স্পোর্টিং পিচ বোলার ও ব্যাটস্‌ম্যান দু'জনের কাছেই আদর্শ। একটা পিচের পেছনে দিন-রাত পরিশ্রম করতে হয়। অনেকটা সন্তান লালনপালন করার মতো। দেখা গেছে, অনেক সময় বিদেশি দল হেরে গেলে পিচের অজুহাত দেয়। তা কিন্তু ঠিক নয়। সেটা হল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার অজুহাত।" উদাহরণ হিসেবে বললেন, "এই ইডেনেই ভারত কত ম্যাচ জিতেছে, আবার কত ম্যাচ হেরেছেও। আবার কোনও ম্যাচের ফয়সালা হয়নি। সেখানে পিচের দোষ কোথায়! ইডেনে খেলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক লয়েড কিন্তু পিচের দোষ দেননি। নিজেদের ব্যর্থতার কথাই স্বীকার করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।"

পিচ তৈরির কাজে মহেশ্বর ফাঁকি দেন না—যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সবটাই দেখাশোনা করেন, যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো হয়ে ওঠে পিচের চরিত্র। বিশেষ করে, 'আউটফিল্ড'-এ সবুজ ঘাসের গালিচায় কোনও ক্ষত যেন জেগে না ওঠে, সেদিকেও তিনি নজর রাখেন।

জনপ্রিয়তায় বার্গক্যাম্পের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন হুগেনব্যান্ড ও ব্রুইন

এই প্রথম কোনও ডাচ সাঁতারু বিশ্বসেরার সম্মান পেলেন। সাঁতারে বিরল প্রতিভার অধিকারী নেদারল্যান্ডসের হুগেনব্যান্ড ও ব্রুইনকে নিয়ে লিখেছেন সুজন ঠাকুরতা

বিশ্বের নামকরা পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড সুইমিং ম্যাগাজিন'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যার বিচারে বিশ্বের সেরা পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুর সম্মান পেলেন নেদারল্যান্ডসের দুই সাঁতারু সিডনি ওলিম্পিকের জলের রাজা-রানি পিটার ভ্যান ডেন হুগেনব্যান্ড ও ইঙ্গে ডি ব্রুইন। এই প্রথম কোনও ডাচ সাঁতারু বিশ্বসেরার পুরস্কার পেলেন। সেরা হওয়ার পথে হুগেনব্যান্ড ও ব্রুইন পেছনে ফেলে দিয়েছেন ইয়ান থর্প, পোপভ, সুসান ও'নীল, পেনি হেইনস প্রমুখ বিশ্বের নামকরা সাঁতারুদের। দুই ডাচ সাঁতারুর এহেন সাফল্যে এই মুহূর্তে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছেন ফুটবলপাগল নেদারল্যান্ডসের আপামর জনসাধারণ। বলা বাহুল্য, ওলিম্পিকের চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের দৌলতেই এই পুরস্কার পেলেন দুই ওলন্দাজ সাঁতারু। সাঁতারের জগতে নিজেদের অবিসংবাদী নায়ক-নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা।

সিডনি ওলিম্পিকের আগে হুগেনব্যান্ডকে কেউ সেরকম গুরুত্ব দিতেন না। আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান থর্প এবং রাশিয়ার আলেকজান্ডার পোপভকে ঘিরে। সারা পৃথিবী যখন ভাবছে যে, কে হবেন ২০০০ সালের ওলিম্পিকের সেরা সাঁতারু, সেই সময় নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব পি. এস. ভি. আইন্দহোভেনের সুইমিং পুলে রসকামের প্রশিক্ষণে নিজেকে গভীর অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছিলেন হুগেনব্যান্ড। মাথায় ছিল শুধু ওলিম্পিক। ওলিম্পিকে ২০০ মিটারের সেমিফাইনালে বিশ্বরেকর্ড করে সেই সাফল্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে পার্ল জ্যামের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ২২ বছরের তরুণ হুগেনব্যান্ড। ফলস্বরূপ ১০০ মিটারের ফাইনালে হট ফেভারিট ক্যাঙারু থর্পেডো ইয়ান থর্পকে পেছনে ফেলে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন তিনি (১ : ৪৫ : ৩৫ সেকেন্ডে)। আর ১০০ মিটারের বিশ্ব ও ইউরো চ্যাম্পিয়ান, পোপভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হন পিটার। ওই ইভেন্টে সেমিফাইনালে বিশ্বরেকর্ড করেন। সাঁতারের জগতে, নতুন শতকের নতুন নায়ক তিনি। হুগেনব্যান্ডের রক্তে সাঁতার। মা ইউরো

হুগেনব্যান্ড

সেরা হওয়ার পথে হুগেনব্যান্ড ও ব্রুইন পেছনে ফেলে দিয়েছেন ইয়ান থর্প, পোপভ,সুসান ও'নীল, পেনি হেইনস প্রমুখ বিশ্বের নামকরা সাঁতারুদের।

চ্যাম্পিয়ানশিপে রুপোজয়ী প্রাক্তন সাঁতারু। বাবা কি সরয়েন প্রাক্তন ওয়াটারপোলো তারকা, এখন পি. এস. ভি-র ডাক্তার। মা, কোচ, ম্যানেজার— এই ত্রয়ীর যোগফলে হুগেনব্যান্ডের সাফল্য। তিনি আজ বিশ্বসেরা। সিডনি গেমসের পর 'হুগি' বলেছেন, "ওলিম্পিকে সোনা জেতা আমার লক্ষ্য ছিল। সেই কাজ করতে পেরে আমি সন্তুষ্ট।" থর্প, পোপভ, কিমের জমানা শেষ করে বিশ্বসাঁতারে হুগেনব্যান্ডের নতুন যুগের সূচনা হল। আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাঁতারু, ডাক্তারির ছাত্র, পিটার ভ্যান ডেন হুগেনব্যান্ড আজ সারা দেশের চোখের মণি।

সিডনি ওলিম্পিকের আগে নেদারল্যান্ডসের ২৭ বছরের তরুণী ইঙ্গে ডি ব্রুইন অবসর ভেঙে ফিরে আসেন কোচ ডারহারেন এবং ম্যানেজার রসকামের উৎসাহ ও প্রেরণায়। একসঙ্গে অভ্যেস করেন পি. এস. ভি. ক্লাবে হুগির সঙ্গে। ফলস্বরূপ সিডনির সুইমিং পুলে ঝড় তুলে, তিন-তিনটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে সবার সেরা বিশ্বসেরা সাঁতারুরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন শতকের ওলিম্পিকের অবিসংবাদী নায়িকা ব্রুইন বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জেতেন ৫০ ও ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই বিভাগে। ওলিম্পিকের দ্রুততমা সাঁতারু হওয়ার পথে তিনি পেছনে ফেলে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সুসান ও'নীল, জেনি টমসন, দক্ষিণ আফ্রিকার পেনি হেইনস প্রমুখ বিশ্বের নামকরা সব সাঁতারুকে। সুন্দরী, লম্বা, ছিপছিপে চেহারার ব্রুইন সাফল্য পেয়েছেন পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর একাগ্রতার জোরে। শারীরিক ক্ষমতা বাড়াতে বল নিয়ে, পায়ে বুট পরে সাঁতার কেটেছেন, প্র্যাকটিস করেছেন রক ক্লাইম্বিং ও তাইকোয়ান্ডো। পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন হাতেনাতে। বিশ্বরেকর্ড গড়ে নজির সৃষ্টি করেছেন তিনি। নেদারল্যান্ডসে এখন জনপ্রিয়তায় বার্গক্যাম্প, ক্লুইভার্ট দের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছেন হুগেনব্যান্ড ও ব্রুইন।

সাবধান সৌরভ, ওদের একটা গিলেসপি আছে

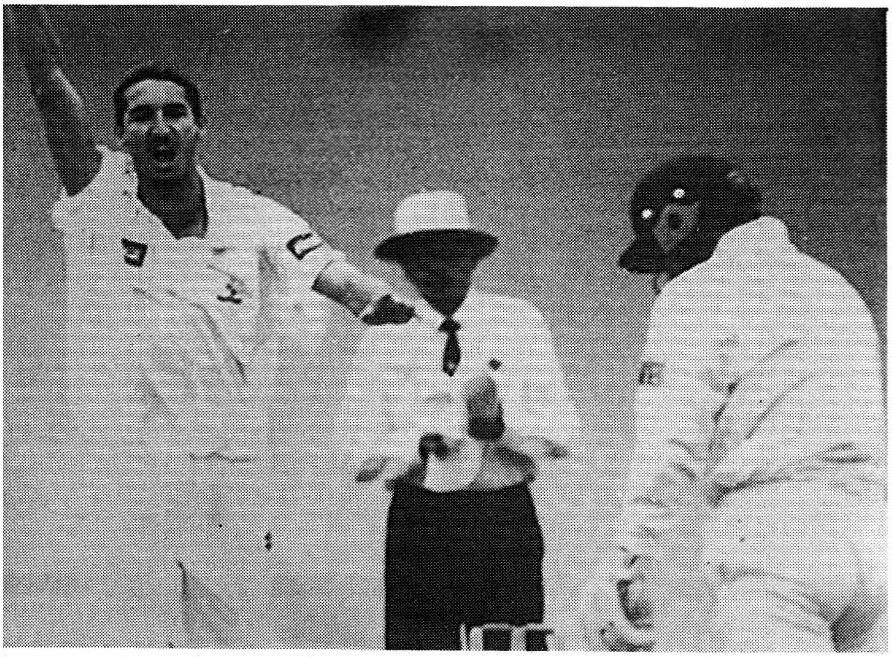

ম্যাকগ্রাকে নিয়ে যতটা হইচই হচ্ছে, গিলেসপিকে নিয়ে ততটা নয়। কিন্তু গোটা ভারতীয় দলকে একাই খেয়ে ফেলার ক্ষমতা আছে গিলেসপির। লিখেছেন পরমজিৎ জানা

অস্ট্রেলিয়া বরাবরই পেস বোলিংয়ে সমৃদ্ধ এবং ওদের পেস বোলাররা প্রায়ই এসেছেন আবার জোড়ায়-জোড়ায়। লিন্ডওয়াল-মিলার, ম্যাকেঞ্জি-ডেভিডসন, লিলি-টমসন, মার্ভ হিউজ-হুইটনি, ম্যাকডারমট, রিডের পর এখন ম্যাকগ্রা-গিলেসপি জুটি। চারজন দ্রুতগতির বোলার নিয়ে এবার ভারত সফরে এসেছে স্টিভ ও'-এর দল — গ্লেন ম্যাকগ্রা, জেসন গিলেসপি, ড্যামিয়েন ফ্লেমিং ও মাইকেল কাসপ্রোউইচ। দলে পেসার কিংবা মিডিয়াম পেসার মিলিয়ে চারজন দ্রুতগতির বোলার থাকলেও টেস্টে কিন্তু সচরাচর খেলানো হয় দু'জনকে। ভারত সফরে আসার আগে স্টিভ ও'-র দল যে টানা ১৫টি টেস্ট জিতে অসাধারণ এক বিশ্বরেকর্ড গড়েছে, সেই ১৫টি টেস্টেই অস্ট্রেলিয়া দলে দেখা গেছে মাত্র চারজন স্পেশ্যালিস্ট বোলার — দু'জন পেসার ও দু'জন স্পিনারকে। দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য একজন স্পিনারের বদলে অতিরিক্ত একজন পেসারকে খেলানো হয়েছে। তবে ইডেনের স্পিনিং উইকেটের কথা চিন্তা করে অস্ট্রেলিয়ার 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' সম্ভবত দুই-দুই, অর্থাৎ দু'জন পেসার ও দু'জন স্পিনার নিয়ে আক্রমণের স্ট্রাটেজি তৈরি করতে পারেন। দু'জন কিংবা তিনজন ফাস্ট বোলার, সংখ্যাটা যাই হোক না কেন, এই সময়ের ফর্ম ও পারফরম্যান্সের বিচারে গ্লেন ম্যাকগ্রার সঙ্গী হওয়ার সম্ভাবনা আছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ২৫ বয়সী পেস বোলার জেসন গিলেসপির। গিলেসপি তাঁর শেষ চারটি টেস্টে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ চারটি টেস্টে পেয়েছেন ১৮.৪০ রানের গড়ে ২০টি উইকেট। এই টেস্ট সিরিজে গ্লেন ম্যাকগ্রা (১৭.৯৫ রানের গড়ে ২১টি উইকেট) ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আর কোনও পেস বোলার এত বেশি উইকেট পাননি। তবে ম্যাকগ্রা খেলেছিলেন পাঁচটি টেস্ট, আর গিলেসপি চারটি। পরিসংখ্যানের এই চিত্রে স্পষ্ট, কতটা বিস্ফোরক ফর্মে আছেন এখন জেসন গিলেসপি।

গিলেসপির পাওয়া এই ২০টি উইকেটের মধ্যে ন'টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি মেলবোর্নের চতুর্থ টেস্টে। প্রথম ইনিংসে ৪৮ রানে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০ রানে ছ'টি উইকেট। ম্যাকগ্রা এই টেস্টে কোনও উইকেট পাননি। ম্যাকগ্রার ব্যর্থতা মেলবোর্নে ঢেকে দিয়েছিলেন গিলেসপি। আর ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানরা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন জেসন গিলেসপির পেসের বিষাক্ত ছোবল কী জিনিস! পেসের রকমফের ও বৈচিত্র্যই জেসন গিলেসপির সেরা অস্ত্র। মূলত তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ের ফলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দু'ইনিংসই শেষ হয়েছিল দু'শোর কম রানে, ১৬৫ ও ১০৯ রানে। এর পরই অধিনায়ক স্টিভ ও' গিলেসপি সম্পর্কে বলেছিলেন, "এবার ওর ওপর আস্থা রাখা যায়।" ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ তিনটি টেস্টে ব্রেট লি-র অভাব ভালভাবেই পূরণ করেছিলেন তিনি।

একজন পেস বোলারের যা-যা গুণ থাকা দরকার, গতি ও সুইং-পেসের রকমফের ও বাউন্সার দেওয়ার ক্ষমতা, সবই আছে জেসন গিলেসপির মধ্যে। তবে চোট-আঘাতের সমস্যাটা তাঁকে খুবই ভুগিয়েছে। চোট-আঘাতের সমস্যা ও ব্রেট লি-র উত্থানের ফলে গত দেড় বছরে গিলেসপি অংশ নিয়েছেন মাত্র চারটি টেস্টে, দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। টেস্টে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ১৯৯৬-'৯৭ সালের মরসুমে সিডনিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ভারত সফরে আসার আগে পর্যন্ত তিনি ১৮টি টেস্টে নিয়েছেন ৭০টি উইকেট (গড় ২১.০৯)। এত ভাল পারফরম্যান্স গ্লেন ম্যাকগ্রা, শেন ওয়ার্ন ও ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়েরও নেই। গিলেসপি ইনিংসে পাঁচটি বা তারও বেশি উইকেট পেয়েছেন পাঁচবার। ইনিংসে সেরা বোলিং ৩৭ রানে সাতটি উইকেট, ১৯৯৭ সালে লিড্‌সে। ম্যাচে ১০টি উইকেট এখনও পাননি। ম্যাচে সেরা বোলিং ৮৮ রানে ন'টি উইকেট, মেলবোর্নে কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এবারের ভারত সফরে স্টিভ ও'-র অন্যতম তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন জেসন গিলেসপি।

গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চলল সন্দীপন

আর একটা নর্ম পেলেই গ্র্যান্ডমাস্টার হবে কুঁদঘাটের ১৭ বছরের এই ছেলে। তাকে নিয়ে লিখেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত

অত পড়ার সময় নেই। খেলতে হবে বেশি। তাই 'কমার্স'।

এমন জায়গায় পড়তে হবে যেখানে রোজ হাজিরার ঝঞ্ঝাট নেই। তাই ন্যাশনাল ওপেন স্কুল।

সত্যজিৎ, শীর্ষেন্দুদের বইয়ের ভক্ত হলেও পড়ার সুযোগ বেজায় কম। তাই বইমেলাতেও যাওয়া হয় না।

রং-তুলি নিয়ে কারবারটা ছিল সেই ছেলেবেলায়। তাই এখন আর প্রিয় রং বলে তেমন কিছু নেই।

লুই ফিগোর 'ড্রিবল্' বা সচিনের ছক্কার ফ্যান? "হলে কী হবে? সময়ই পাই না। অথচ ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে!"

এই হচ্ছে কুঁদঘাটের সন্দীপন চন্দ। বয়স ১৭। ১২ ক্লাসে পড়ছে। বাবা সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এসবের কোনওটাই অবশ্য ওর আসল পরিচয় নয়।

আসল পরিচয় এখন সবাই জানে। দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার প্রায় হয়েই গেছে ছেলেটা। একটা জি এম নর্ম ছিলই। একটা পেল এবারের গুডরিকে। তৃতীয় বা শেষটাও যে-কোনও সময়ে পেয়ে যাবে।

কেমন খেলে সন্দীপন?

প্রশ্নটা সরাসরি করা হল কলকাতার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টারকে। দিব্যেন্দু বললেন, "ইদানীং সত্যিই দারুণ খেলছে। বড় ব্যাপার, ভীষণ লড়াকু। নর্ম, টুর্নামেন্টে কী হবে এসব বিশেষ ভাবে না। ঝুঁকি নেয় যখন-তখন।"

কলকাতার হবু গ্র্যান্ডমাস্টার সন্দীপনের দাবাড়ু হওয়ার ঘটনা অন্যদের মতোই। ছেলেবেলায় এক দূর সম্পর্কের ভাইকে দেখে শুরু। ঘটনাক্রমে দাবার নামী কোচ পরিতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ। তাঁর হাত ধরেই চলে আসা আলেখিন চেজ ক্লাবে। দেখতে দেখতে অনূর্ধ্ব ১০-এ জাতীয় চ্যাম্পিয়ান। পরে মুম্বইয়ে রেটিং টুর্নামেন্টে শিরোপা। কমনওয়েলথ দাবায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। গুডরিক দাবা অ্যাকাডেমিতে আরও তৈরি হওয়া। এবং দুটো জি এম নর্ম পরপর দু'বছর গুডরিকেই।

দাবাড়ু হওয়াটা অন্যদের মতো হলেও সন্দীপন কিন্তু অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা। কোথায় আলাদা? সে প্রথমত জানাচ্ছে, চাকরি পাওয়ার জন্য দাবা খেলে না। পেশাদার হওয়াই লক্ষ্য। 'আইডল' বিশ্বনাথন আনন্দের রাস্তাতেই

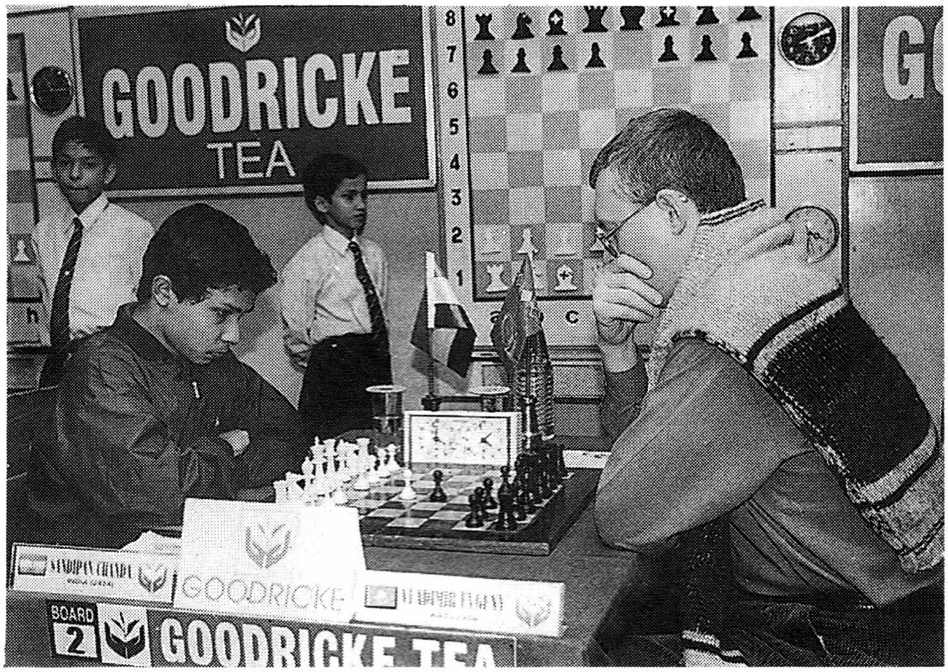

গুডরিক দাবায় সন্দীপন চন্দ (বাঁ দিকে) বিপক্ষে ভ্লাদিমির এফগেনি ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

হাঁটতে চায়। "ভাল খেললে আমাদের দেশেই এখন অনেক টুর্নামেন্ট। তা থেকেই রোজগার হতে পারে। আমার চলেও যাবে।"

এমন কথা এই বাংলার খুব বেশি দাবাড়ু বলেনি।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, 'ধীরে চলো' নীতি। কোনও কিছুতেই তাড়াহুড়োয় বিশ্বাসী নয়। ওইটুকু হরিকৃষ্ণের জামাতেও 'লোগো'! তোমার এখনও 'স্পনসর' নেই? এসব বললে জবাব দেয়, "দাবা খেলি। স্পনসর পেলে ভাল হয়। বিশেষ করে 'ল্যাপটপ' থাকলে বিদেশে খুব সুবিধা। কিন্তু বিশেষ ভাবতে চাই না এসব। তা ছাড়া গুডরিক দাবা অ্যাকাডেমিতে সবাই সাহায্য করছেন। আমাকে নিজের খেলা খেলে যেতে হবে। যখন খেলতে বসি তখন বোর্ডের ৬৪টা খোপই মাথায় থাকে। অন্য কিছু নয়। আই এম বা জি এম নর্ম নিয়েও খুব বেশি ভাবিনি। নিজের খেলা নিয়েই কাজ করেছি। কোনও সময়সীমা মাথায় রাখি না। যদি ভাল খেলতে পারি তা হলে একদিন সব পাব। না পারলে পাব না। সহজ ব্যাপার।"

এমনই সন্দীপন।

এবারের গুডরিক দাবার কথাই ধরা যাক। বিশ্বের ধনী দেশগুলির একটা সুইজারল্যান্ড। সেখানেই দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার মাত্র চারজন। তার দু'জন আবার বিদেশ থেকে এসে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। একজন বিখ্যাত ভিক্টর কর্শনয়। অন্যজন 'আসলে ইংরেজ' জোসেফ গালাঘার, যিনি এবার গুডরিক দাবায় চ্যাম্পিয়ান হলেন মোট আট পয়েন্ট পেয়ে। এবং দরিদ্র দেশগুলির অন্যতম ভারতের সন্দীপন টুর্নামেন্ট শেষ করল তাঁর থেকে মাত্র আধ পয়েন্ট কমে। যার কোনও স্পনসর নেই। নেই সামান্য ল্যাপটপও। যেখানে দাবার টাইম কন্ট্রোলের নতুন নিয়মকে সামলাতে হিমশিম খেলেন গ্যারি কাসপারভের বর্তমান সেকেন্ড আন্দ্রেই খারলভও, সেখানে ১১ রাউন্ডে সাড়ে সাত বিরাট ব্যাপার। "সন্দীপন একেবারে অন্যরকম। এই ছেলেটা অনেকদূর যাবেই," খারলভ তো রীতিমত উচ্ছ্বসিত।

উচ্ছ্বাস নেই একজনেরই। "হ্যাঁ, এবার ভাল খেলেছি। কিন্তু শেষ ম্যাচটায় বেশ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। অনেক কষ্টে ম্যাচটা ড্র করেছি।"

আত্মতুষ্টি যার স্বভাবে নেই, সে কিস্তি মাত তো করবেই।

খেলার খবর

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

নায়ক ভাইচুং

● ইংল্যান্ডের পেশাদারি লিগে খেলার সাহস দেখিয়ে সকলের নজর কেড়েছিলেন ভারতের একালের অন্যতম সেরা ফুটবলার ভাইচুং ভুটিয়া। প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব বারিতে জায়গা করে নিতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে এই দক্ষ ফরওয়ার্ডটিকে। এখন তিনিই ক্লাবের সম্পদ। কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তানের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি সিটি এবং বারির বিপক্ষে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। বারির বিপক্ষে ম্যাচটি ২১ মার্চ হওয়ার কথা। বারি ক্লাবের আর্থিক অবস্থা এখন মোটেই ভাল নয়। 'এশিয়ান প্লেয়ার' ভাইচুং ভুটিয়াকে সামনে রেখে ক্লাব এই ম্যাচে বেশ কিছু অর্থ রোজগারের আশা করছে। ক্লাবের চেয়ারম্যান টেরি রবিনসন জানিয়েছেন, "এরকম একটা ঐতিহাসিক ম্যাচে অংশ নিতে পেরে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। বারি এবং তার আশপাশের শহর ও গ্রামে পাকিস্তান থেকে আসা অনেক লোকজন থাকেন। আমার ধারণা, তাঁরা নিশ্চয়ই দলে দলে এই ম্যাচ দেখতে আসবেন।" তিনি আরও বলেছেন, "সবচেয়ে বড় কথা, ইংল্যান্ডে আমরাই প্রথম ক্লাব যাঁরা এশিয়ার একজন খেলোয়াড়কে সই করিয়েছি। আশা করি ভাইচুংয়ের উপস্থিতি ম্যাচ দেখতে তাঁদের আরও উৎসাহিত করবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তানের জাতীয় ফুটবল দল এই প্রথম ইংল্যান্ড সফর করছে।

গ্রামের ক্রিকেটে লারা

● ফর্ম ভাল যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তাঁর চাহিদা এতটুকু কমেনি। বিশ্বক্রিকেটের রাজপুত্র হিসেবে পরিচিত ব্রায়ান লারা তাঁর ব্যাটিং-টেকনিক, চোখধাঁধানো দক্ষতার জন্য এখনও দর্শকদের কাছে সমান আদৃত। তাঁর এই ব্যাটিং-ম্যাজিক দেখার জন্যই তাঁকে এই মরসুমে ইংল্যান্ডের এক গ্রামীণ দলে খেলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই খেলার জন্য তাঁকে বিরাট অঙ্কের সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে। 'লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা জানাচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক কোটিপতি ব্যবসায়ী, ইন্টারনেট সংস্থার প্রধান সিমন নোবেল বাঁ-হাতি লারাকে খেলানোর মূল উদ্যোক্তা। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের মাইনর লিগের লার্সিং ক্লাবে তিনি লারাকে এই মরসুমেই খেলাতে চান। মেডস্টোনের ওই ক্লাবটির প্রধান 'স্পনসর' হলেন নোবেল। নোবেল অ্যান্টিগার এক সংবাদপত্রকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, লার্সিং-এ অনেক প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড় আছেন যাঁরা ঠিকমতো ট্রেনিং পেলে ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে চলে আসতে পারেন। ব্রায়ান লারা যদি তাঁদের সঙ্গে খেলেন তা হলে তাঁরা দারুণভাবে উপকৃত হবেন। লারার খেলা দেখে তাঁরা শিখবেন, তাঁর উপস্থিতি ওইসব খেলোয়াড়দের সাহস জোগাবে।

খেলা ছাড়লেন স্কিমিচেল

● ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত গোলরক্ষক পিটার স্কিমিচেল আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি খেলা ছাড়ার কথা ভাবছিলেন। এক বিবৃতিতে স্কিমিচেল জানিয়েছেন, "১৪ বছর ধরে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছি আমি। বহু উপভোগ্য ম্যাচে শামিল হয়েছি। এখন নতুন কোনও গোলরক্ষক উঠে আসা উচিত। ফুটবল মাঠের রোমাঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে ভাল লাগে না। কিন্তু দেশের স্বার্থেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম।" তবে ৩৭ বছরের স্কিমিচেল তাঁর ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে খেলবেন আরও কিছুদিন।

দর্শক

ঋতু অনেক,একই সাবান,সুলভ দাম।

বিভিন্ন মরশুমে আমাদের ত্বক নানারকম কার্যকারণ ও পদার্থের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রীষ্মে আসে তাপ ও ঘামের প্রকোপ, শীতের সঙ্গে সঙ্গে আসে শুষ্কতা আর বর্ষাতে নানারকম ত্বকের সংক্রমণ। মেডিমিক্স-এ খাঁটি নারকোল তেলে থাকা 18-টি ভেষজের গুণ ত্বক ও চুল রাখে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আর্দ্রতাময় ও দীপ্ত - সারাটা বছর ধরে, সবচেয়ে কম খরচে।

ভেষজ	ভেষজের ক্রিয়া
কুটজা, চোপচিনি, ভিড়ঙ্গ ও জ্যোতিষ্মতী	সৌন্দর্যবর্দ্ধক
উশীরম, সারিবা ও ধান্যকা	ঘামাচিনাশক
গুগ্‌গুল, দেবদারু ও নিম্বত্বক	জীবাণুনাশক
চিত্রকা ও দারুহরিদ্রা	ব্রণরোধক
বনার্দ্রকা, কৃষ্ণজীরকা ও জীরকা	ডিওডোর‍্যান্ট
বচা, বাকুচি ও যষ্টিমধু	খুসকিনাশক

পরিপূর্ণ আয়ুর্বেদিক স্নানের জন্যে

পরিবারের প্রিয়

মেডিমিক্স সাবান

100% ভেজিটারিয়ান সাবান। খাঁটি নারকোল তেলে তৈরি, এমনকি সমুদ্রের জলেও বেশি ফেনা হয়।

75 এবং 125 গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়।

www.medimixindia.com

Pen a Trait/DD-60/Ben

ANANDAMELA 14 MARCH 2001 REGD NO. WB/RNP/183 & WB/RNP/FGN/03
MH/MBI-SOUTH/683/97/TN/MS (C) 731, RNI NO. 27057/75 RS. 10.00

মশার ধূপ মানেই সারারাত জ্বলে
কিন্তু ঘরের কোণে-কোণে পৌঁছয় কি ?

জ্যোতি ল্যাবরেটরিজ নিয়ে এল

এবার কয়েল নিয়ে আর টানাটানি নয়। এসে গেল নতুন ম্যাক্সো সাইক্লোথ্রিন কয়েল। ঘরের যেখানেই রাখুন না কেন, এর সাইক্লোথ্রিন একশান ঘূর্ণির মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে, কোণে-কোণে গিয়ে লুকোনো মশাও তাড়ায়। যা সাধারণ কয়েল কখনও করতে পারে না। মশা তাড়ানোয় ম্যাক্সো - একাই একশো।

MAXO™
Cyclothrin™ Coils
মশা তাড়ানোয় একাই একশো

From the house of Jyothy Laboratories Ltd.

Situations/MAXO/9/2000 Ben